SOCIALIST UNITY CENTRE OF INDIA
(West Bengal State Committee)
48, Dharamtala Street, Calcutta-13.

নভেম্বর বিপ্লব সংখ্যা

এই সংখ্যায় আছে

★ নভেম্বর দিবসের ফতোয়া
(কেন্দ্রীয় কমিটির ঘোষণা)

★ ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন কোন পথে

★ নভেম্বর বিপ্লব

গণদাবী

সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের বাংলা মুখপত্র (পাক্ষিক)
প্রধান সম্পাদক—সুবোধ ব্যানার্জী

১ম বর্ষ, বিশেষ সংখ্যা] সোমবার, ১৫ই নবেম্বর ১৯৪৮, ২৮শে কার্ত্তিক ১৩৫৫ [মূল্য—চার আনা

এই সংখ্যায় আছে

★ চীনের মুক্তি আন্দোলন

★ ছাত্র আন্দোলনের গতি প্রকৃতি

★ কৃষক আন্দোলনের পথ নির্দ্দেশ

★ বাস্তুহারা

নভেম্বর বিপ্লব জয়যুক্ত হোক

বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক

★ নভেম্বর বিপ্লব দিবসের ফতোয়া ★

● সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের কেন্দ্রীয় কমিটির ঘোষণা ●

১৯১৭ সালের নভেম্বর মাসে রাশিয়ার সফল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সারা বিশ্বের ইতিহাসে যে নবযুগের সূচনা এনে দিয়েছে আজ ৩১ বছর পরে তার গুরুত্ব, তার ঐতিহাসিক নির্দ্দেশ, তার প্রকৃত শিক্ষা আমাদের নোতুন করে ভালভাবে বোঝার এবং বোঝাবার দিন এসেছে। এর মধ্যে দিয়েই রচিত হবে ভারতবের ভবিষ্যত বিপ্লবের পথ। সেই চেষ্টাই সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টার করে আসছে। সুতরাং বর্ত্তমানের আন্তর্জাতিক সর্বহারা বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্কটপূর্ণ সময়ে তার আন্তর্জাতিক অবস্থা ও বিশেষ করে জাতীয় অবস্থার বিচার বিশ্লেষণকে বাদ দিয়ে যে ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে তার জন্ম, গঠন ও গতি তাকে অস্বীকার করে সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের ঐতিহাসিক দায়িত্বের ওপর যথাযথ গুরুত্ব আরোপ না করার অর্থ দুনিয়া জোড়া যে গণমুক্তি আন্দোলন সাম্যবাদীদের দ্বারা দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদ ফ্যাসীবাদ ও পুঁজিবাদের উচ্ছেদের উদ্দেশ্যে, সোভিয়েট ইউনিয়ন ও নয়া গণতান্ত্রিক দেশগুলির নেতৃত্বে, সফল পরিসমাপ্তির দিকে দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছে তার প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা। সাম্যবাদী আন্দোলনে চিন্তাধারা ও কর্ম্মপদ্ধতির নির্ভুলতা সম্বন্ধে উপযুক্ত সচেতনতা অবলম্বন না করে যেহেতু আজ পর্য্যন্তও কম্যুনিষ্ট পার্টি ছাড়া অন্য কোন শ্রমিক দল দেশে উপস্থিত নেই এবং শ্রমিক ও কৃষকের উপর কার্য্যকরী ভাবে আর কারও কোন বিশেষ সংগঠন নেই শুধু মাত্র এই অর্থহীন যুক্তি প্রয়োগ করে যথাযথ আদর্শ ও বৈজ্ঞানিক কর্ম্মপদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে নোতুনভাবে সত্যিকারের শ্রমিকশ্রেণীর দল গঠনের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করা বিপ্লবী দায়িত্ব পালনে অক্ষমতারই পরিচায়ক। আমাদের আদর্শগত সংগ্রামই কার্য্যকরীভাবে বিপ্লবী মজুর কিষাণ ছাত্র সংগঠন গড়ে তুলতে পারে। সংগঠন গড়ে তুলতে গিয়ে মার্কসবাদীদের এক মুহূর্তের জন্য একথা ভুললে চলবেনা —(১) কি উদ্দেশ্যে সংগঠন গড়ে তুলছি, (২) সংগঠনের রূপ কি হবে (৩) সংগঠনের মূল ও সাহায্যকারীশক্তি কোন কোন শ্রেণী (৪) লড়াই মুখ্যতঃ কার বিরুদ্ধে (৫) সংগ্রামের আশু উদ্দেশ্য ও মূল লক্ষ্য কি (৬) লড়াইএর মূল কৌশল ও তার ওপর ভিত্তি করে দৈনন্দিন কর্ম্মপন্থা কি হবে। অথচ এই অত্যাবশ্যকীয় বিষয়গুলির প্রতি কিছু মাত্র ভ্রুক্ষেপ না করে আমাদের দেশের তথাকথিত সাম্যবাদী আন্দোলন একদিকে কর্মীদের শৃঙ্খলাবোধ ও দলের প্রতি অন্ধ আনুগত্য ও অন্যদিকে দৈনন্দিন দাবীদাওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে শ্রমিক কৃষকের সংগঠন কেবলমাত্র দল বাড়াবার জন্যই গড়ে তুলেছে। এতদিনেও কেন সাম্যবাদী আন্দোলন প্রকৃত পথ বেয়ে গড়ে ওঠেনি, আজকের এই জটিল রাজনৈতিক আবহাওয়ায় নোতুন করে শ্রমিক শ্রেণীর দল গড়ে তোলা যাবে কিনা, ভুলত্রুটি ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টির যাই থাকুক না কেন শুধুমাত্র "আন্তর্জাতীকতার" জোরেই বিপ্লবে সঠিক নেতৃত্ব দেবে, এই ধরণের যুক্তির অবতারনা করে আমাদের দেশে বিপ্লবী দল গঠনের দায়িত্ব অস্বীকার করলে আন্তর্জাতীক সাম্যবাদী আন্দোলনের মুখোমুখী দাঁড়িয়েই একদিন তার কৈফিয়ৎ দিতে হবে। ৮ নভেম্বর বিপ্লব দিবসে তাই সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টার এই ঘোষণাই করছে যে, শোষিত ভারতীয় জনসাধারণকে সর্বপ্রকার বিভ্রান্তিকর মতবাদের হাত থেকে রক্ষা করে সঠিক কর্ম্মপন্থার ভিত্তিতে বিপ্লবের পথে পরিচালিত করবে, তীব্র আদর্শগত সংগ্রাম চালিয়ে একদিকে নরম গরম সর্বপ্রকারের বুর্জোয়া ও আধাবুর্জোয়া মতবাদের মুখোস খুলে দেবে অন্যদিকে বিপ্লবী মার্কসবাদকে revisionism ও distortion থেকে রক্ষা করে এর বিপ্লবী ঐতিহ্যকে প্রতিষ্ঠা করবে।

কাজে কাজেই মজুর, কৃষক, ছাত্র, কেরাণীর রুটী রোজগারের সংগ্রাম থেকে যাঁরা আজ দূরে সরে দাঁড়িয়ে নেই, শুধুমাত্র অর্থনৈতিক সুখ সুবিধা আদায়ের ক্ষেত্রে সংঘবদ্ধভাবে লড়লেও রাজনৈতিক স্বার্থে যতদিন পর্য্যন্ত না তাঁরা ঐক্যবদ্ধ আঘাত হানবার উপযুক্ত শক্তি সঞ্চয় করছেন ততদিন পর্য্যন্ত সফল বিপ্লব পরিচালনার কাজ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। প্রত্যেকটি শোষিত মানুষের কাছে আজ এই কথাটি পৌঁছিয়ে দিতে হবে — রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে দূরে সরে থাকলে বিপদ বাড়ান ছাড়া কমান যাবে না। গণমুক্তি আন্দোলন যতদিন পর্য্যন্ত না ধনিক রাষ্ট্রের পতন ঘটিয়ে অগণিত শোষিত মানবের স্বার্থে প্রকৃত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে পারবে ততদিন পর্য্যন্ত জনসাধারণের মূলসমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। আর আজকের এই ক্রমবর্দ্ধমান গণচেতনাকে গণআন্দোলনে রূপ দিয়ে সফল বিপ্লবের পথে পরিচালিত করা একমাত্র সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের বৈপ্লবিক মতবাদ ও বাস্তব কর্ম্মপন্থার ওপর ভিত্তি করেই সম্ভব। সংগঠন হিসেবে আজও আমরা যথোপযুক্ত শক্তি সঞ্চয় করতে পারিনি একথা অবশ্য স্বীকার্য; তাই জনতার কাছেই জনগনের বিপ্লবী দল ও তার সংগঠন গড়ে তোলবার দায়িত্ব পালনের আহ্বান সাংগঠনিক আন্দোলন ও ব্যাপক প্রচারের মধ্যে দিয়ে চালিয়ে যেতে হবে। জনতাকে এ কথা বোঝাতেই হবে—"without a revolutionary theory there can not be revolutionary party"—বিপ্লবী মতবাদ ব্যতীত বিপ্লবী দলের অস্তিত্ব সম্ভব নয়। কাজেই এ ক্ষেত্রে দল বড় কি ছোট এ প্রশ্ন শুধু অবান্তর নয় দল চিনে নেবার ক্ষেত্রে মারাত্মক বিচ্যুতির সৃষ্টি করবে।

সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের সভ্যদের আজ প্রধান কর্ত্তব্য হচ্ছে আমাদের দেশের সোস্যাল ডিমোক্র্যাটরা (সোস্যালিষ্ট পার্টি) বিশ্ব সোস্যাল ডিমোক্র্যাসির যুক্তির প্রতিধ্বনি করে সাম্রাজ্যবাদীদের প্ররোচনায় যে তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধ বেধে উঠতে যাচ্ছে তাতে তৃতীয় শক্তির ভূমিকা গ্রহণের কথা বলে শ্রমিক কৃষক মধ্যবিত্ত শ্রেণী উপশ্রেণীদের সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদবিরোধী গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির ঐক্যফ্রণ্ট থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে তাকে দুর্বল করে পুঁজিবাদী ফ্যাসীবাদী শিবিরকে শক্তিশালী করার যে অপচেষ্টা করছে তা থেকে জনসাধারণকে মুক্ত করা; সাথে সাথে কমিনফর্মের নির্দেশকে ভুল বোঝার দরুণ সাম্যবাদী শিবিরে আগামী তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বিষয়ে যে দুই ধরণের বিভ্রান্তি দেখা দিয়াছে তাকে উৎখাত করা। একদিকে গ্রেটবৃটেন ও আমেরিকার কম্যুনিষ্টদল দক্ষিণ পন্থীয় বিচ্যুতি জনিত সংস্কারবাদী দৃষ্টিভঙ্গির জন্য কমিনফর্মের নির্দেশকে এইভাবে দেখেছে যে সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদকে বাঁচিয়ে রেখেই কেবলমাত্র Left wing Labour Government প্রতিষ্ঠা করে যুদ্ধকে ঠেকিয়ে রাখা যাবে অন্যদিকে ভারতের কম্যুনিষ্ট দল মনে করে জনসাধারণের খণ্ড খণ্ড সংগ্রামকে চূড়ান্ত ক্ষমতা দখলের সংগ্রামের রূপ দিয়ে এখনই পুঁজিবাদী শক্তিগুলির উচ্ছেদ করে সফল বিপ্লবের পথে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধকে রোখা যাবে। এই দুই মতবাদই ভ্রান্ত কারণ একদিকে যেমন পুঁজিবাদকে সম্পূর্ণরূপে উৎখাত না করতে পারলে যুদ্ধকে ঠেকাবার কোন উপায় নেই অন্যদিকে বিশ্বপুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করাও আবার বিশ্বযুদ্ধের সুযোগ গ্রহণ ব্যতীত বাস্তবভাবে সম্ভবপর নয়, কাজেই সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদীরা জনস্বার্থকে গ্রাস করবার উদ্দেশ্যেই যুদ্ধ বাধাবে যখন, তখন জনস্বার্থের নেতা হিসেবে সোভিয়েট ইউনিয়ন ও নয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিকে আগামী তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে প্রতিরোধসংগ্রাম করতেই হবে এবং সাম্রাজ্যবাদীদের প্ররোচনায় যে তৃতীয় যুদ্ধ লাগবে তারই মধ্যে যখন বিশ্বপুঁজিবাদকে নিশ্চিহ্ন করার উপযুক্ত পরিপ্রেক্ষিত উন্মুক্ত হবে তখন, এখনই খণ্ড খণ্ড সংঘর্ষকে চূড়ান্ত রূপ দেওয়ার অর্থ উপযুক্ত সময়ের আগেই জনসাধারণকে সংগ্রামে টেনে এনে দুর্বল করা এবং নিশ্চিহ্ন করার সুযোগ পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে তুলে দেওয়া আমাদের, এ কথাটার সত্যতা ফ্রান্সের কম্যুনিষ্ট দলের ব্যবহারে প্রমানিত হচ্ছে। কম্যুনিষ্টদলগুলির মধ্যে ফ্রান্সের কম্যুনিষ্টদল আজ এত শক্তিশালী যে, যে কোন রাজনৈতিক আহ্বানে সেই সমগ্র শ্রমিক শ্রেণীকে কার্য্যকরীভাবে তার পেছনে টেনে আনতে পারে, সৈন্যদলের মধ্যে প্রতি চার জন সৈন্যের মধ্যে একজন করে সৈন্য যেখানে কম্যুনিষ্ট সেখানে আজই ক্ষমতার জন্য তারা লড়াই আরম্ভ করে দেয় নি কেন? এ কথা বুঝতে পারলেই আমাদের বিশ্লেষণের নির্ভুলতা প্রমানিত হবে। শুধু তাই নয় কমরেড জিমিট্রভের যুদ্ধ সংক্রান্ত সর্বশেষ বিবৃতি থেকেও আমাদের যুক্তি নির্ভুলতার প্রমান মিলবে

সাম্রাজ্যবাদী ও ফ্যাসীবাদিদের যুদ্ধ প্রচেষ্টা ও সাম্রাজ্যবাদী শোষণনীতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন

(১৯শ পৃষ্ঠায় দেখুন)

শিবদাস ঘোষ
সাধারণ সম্পাদক, কেন্দ্রীয় কমিটি, এস-ইউ-সি

★ ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন কোন পথে ★

সংগ্রামের শিক্ষাশিবির :

মার্কসবাদী দলের নিকট ট্রেড ইউনিয়নগুলি হইতেছে শ্রমিকশ্রেণীকে শ্রেণীসংগ্রাম শিক্ষা দিবার প্রধান কেন্দ্র। ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় পুঁজিবাদী অত্যাচার ও শোষণের ফলে শ্রমজীবী শ্রেণী উপশ্রেণীগুলির একটা স্বাভাবিক বিক্ষোভ থাকে কিন্তু এই স্বতঃস্ফূর্ত্ত বিক্ষোভের কোন নির্দ্দিষ্ট রূপ থাকে না। সাম্যবাদী ফতোয়াতে আছে—"প্রথমে শ্রমিক একা একা আন্দোলন করে; তাহার পর এক কারখানার শ্রমিকরা একত্রে আন্দোলন করে; ইহার পর কোন এক বিশেষ এলাকার শিল্প শ্রমিকরা আন্দোলনে যোগ দেয়, ধনিক শোষকদের ব্যক্তিগত আক্রমন করে। তাহাদের আক্রমন চলে উৎপাদন যন্ত্রের উপর, ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার উপর নহে।" দৈনন্দিন অভাব অভিযোগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম সংঘবদ্ধ ভাবে কিছু কিছু শ্রেণী সচেতনা লইয়া লড়িলেও ইহার দ্বারা শোষণের মূল কারণ যে দূরীভূত হইতে পারে না তাহা শ্রমিককে বুঝাইবার দরকার আছে। তাহারই ক্ষেত্র হইল ট্রেড ইউনিয়ন। শ্রমিকেরা ট্রেড ইউনিয়নগুলির মধ্য দিয়া মজুরী বৃদ্ধির জন্য লড়াই করে, পরিশ্রমের সময় চাকুরীর স্থায়িত্ব প্রভৃতি নানাপ্রকার অর্থনৈতিক সুখ সুবিধার জন্য আন্দোলন করে কিন্তু যেহেতু এই আন্দোলনগুলি মূলতঃ সংস্কারবাদী, অর্থনৈতিক কাঠামো পরিবর্ত্তনের জন্য রাজনৈতিক সংগ্রাম নহে, সেইহেতু রাজনৈতিক জীবনে ইহার প্রভাবের পরিধিও খুব সুদূর প্রসারী নয়। তবে যখনই শ্রমিকেরা আন্দোলনের জন্য একতাবদ্ধ হইতে চেষ্টা করে তখনই মালিক-শ্রেণীর সহিত সংঘর্ষের জন্য তাহাকে মুখোমুখী দাঁড়াইতে হয়; ফলে বিভিন্ন শ্রমিকদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধতা ও সমশ্রেণীস্বার্থবোধ জাগিয়া উঠে। এই সচেতনাই বিপ্লবী দলের মূলধন; ইহাকেই দল রাজনৈতিক রূপ দেয় শ্রমিকদের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক চেতনা সঞ্চার করিয়া। রাষ্ট্র হইতেছে এক শ্রেণী কর্তৃক অপর শ্রেণীকে শোষণ করিবার যন্ত্র; সুতরাং ধনিক মালিক শ্রেণীর সহিত শোষিত শ্রমজীবী শ্রেণীগুলির এই সংগ্রামে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রশক্তি মালিকের পিছনে আসিয়া দাঁড়ায়। সহজেই প্রাত্যহিক অর্থনৈতিক দাবীদাওয়ার সংগ্রামের মারফৎ শ্রমিককে রাজনৈতিক সচেতন করিয়া তুলিয়া পুজিবাদী রাষ্ট্রবিরোধী সমাজতান্ত্রিক শক্তিতে পরিণত করা যায়।

দলের কাজ

শ্রমিক শ্রেণীর দলের প্রয়োজন এইখানেই। "সাম্যবাদীরা উপস্থিত দাবী আদায়ের জন্য সংগ্রাম করে, শ্রমিকদের সাময়িক স্বার্থের জন্য সংগ্রাম করে।" কিন্তু শ্রমিক শ্রেণীর দলের নিকট এই আন্দোলনগুলির সফলতাই একমাত্র লক্ষ্য নহে। তাহাদিগকে জানিতে হইবে—"এই সব সংগ্রাম মূল কারণের বিরুদ্ধে নহে, তাহার ফলের বিরুদ্ধে। এই সংগ্রাম সেই কালের গতি পরিবর্ত্তন করিতে পারে না। যাহাতে উহা আরও নীচে নামিয়া না যায় তাহার সাময়িক ব্যবস্থা ইহারা করিতে পারে। ইহাতে মূল ব্যাধি দূর করা যায় না, সাময়িক আরাম দিবার ব্যবস্থা করা হয় মাত্র" (মার্কস-মূল্য দর মুনাফা)। মূল ব্যাধি দূর করাই দলের লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যে পৌঁছাইতে হইলে চাই শোষিত শ্রেণী উপশ্রেণী গুলির সহিত সংযোগ স্থাপন তাহাদিগের উপর রাজনৈতিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা। ট্রেডইউনিয়নগুলি সাধারণ শ্রমিকের সহিত দলের সংযোগ ঘটাইয়া দেয় এবং তাহাদের দৈনন্দিন সংগ্রামের সফলতার জন্য দলের সকল রকম সাহায্য সম্পূর্ণ সমর্থন এবং অকুণ্ঠ সংগ্রামের মধ্য দিয়া দল তাহার নেতৃত্ব স্থাপন করে সাধারণ শ্রমিকের উপর মতবাদিক আন্দোলনের মধ্য দিয়া। এই নেতৃত্বের জোরেই শ্রমিক শ্রেণীর দল শ্রমিককে বিপ্লবের প্রধান শক্তিতে পরিণত করে। রাজনৈতিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করাই আসল লক্ষ্য, এই দৈনন্দিন সংস্কারবাদী আন্দোলন-গুলি তাহার উপায়। সুতরাং বিপ্লবী দলের নিকট কতগুলি ট্রেডইউনিয়ন তাহার অধিকারে, কতটুকু অর্থনৈতিক সুবিধা শ্রমিকদের জন্য আদায় করিতে পারিয়াছে এই সব প্রশ্নের কোনই মূল্য নাই যদি তাহার সহিত রাজনৈতিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার কোন সম্বন্ধই না থাকে। নেতৃত্ব করার অর্থ জনপ্রিয় দাবীর পিছন পিছন চলা নহে বরং জনতার জনপ্রিয় দাবীগুলিকে মূল লক্ষ্যের দিকে চালনা করা।

অতীতের ভুল ত্রুটি

অথচ "অতীতে এইখানেই আমরা চূড়ান্ত ভুল করিয়াছি। আন্দোলন যত করিয়াছি তাহার সামান্যতম অংশ দেশের উপর রাজনৈতিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার, মুখে বলিলেও কার্য্যক্রমের সীমাবদ্ধতা ও দল বাড়াইবার মোহে, চেষ্টা করি নাই। ভারতের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে বামপন্থী দলগুলির অবদানের নিকট দক্ষিণ পন্থী নেতৃত্ব ম্লান হইয়া যায় তথাপি চিন্তাগত নেতৃত্বের জোরে শেষোক্তরাই রাষ্ট্র ক্ষমতা করায়ত্ত করিয়াছে। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ইতিহাসও তাহাই। শ্রমিক শ্রেণীর দৈনন্দিন দাবী দাওয়া লইয়া প্রায় প্রতিটি আন্দোলনই পরিচালিত করিয়াছে ভারতবর্ষের বাম-পন্থীরা, খাঁটি কংগ্রেসীরা শ্রমিক আন্দোলনের সহিত খুব ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্তই নহে কিন্তু দেশে বিপ্লবী নেতৃত্বের অভাব থাকায় এবং সমগ্র দেশের উপর কার্য্যতঃ কংগ্রেস তথা উপনিবেশিক ধনিক শ্রেণীর আদর্শগত নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকায় শ্রমিক শ্রেণীও তাহার দ্বারা প্রভাবিত ও পরি-চালিত হইতেছে। ইহাই যে বাস্তব অবস্থা তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। যেখানে দৈনন্দিন সংস্কারপন্থী অর্থ-নৈতিক আন্দোলনগুলিকে কেন্দ্র করিয়া শ্রমিকের শ্রেণীসচেতনতা বৃদ্ধি করা ও তাহাদের উপর রাজনৈতিক নেতৃত্ব কায়েম করিবার কথা সেইখানে এই সংস্কারপন্থী আন্দোলন যত করা হইয়াছে তাহার ভগ্নাংশও চেষ্টা হয় নাই রাজনৈতিক সচেতনতা বাড়াইতে। শুধু তাহাই নহে অনেকেই এই মজুরীর লড়াই কিংবা ট্রেড ইউনিয়নগুলি হইতে দুই এক জন দলের কর্মী পাওয়াকেই মূল লক্ষ্য মনে করিয়াছিলেন। এই ধারণা মারাত্মক-ভাবে ভ্রান্তিপূর্ণ। কোন দলই আশা করিতে পারে না প্রত্যেক শ্রমিক তাহার দলের সভ্য হইবে এবং ইহা না হইলে যে নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল না তাহা নহে। সভ্য নহে এমন বহু শ্রমিকই বিপ্লবী দলের রাজনৈতিক আহ্বানে সাড়া দিতে বাধ্য যদি সেই দলের রাজ-নৈতিক নেতৃত্ব সাধারণ ভাবে শ্রমিকের উপর কায়েম থাকে। সুতরাং নেতৃত্ব আছে কি নেই তাহার বিচার করিতে হইবে রাজনৈতিক প্রশ্নে শ্রমিকের দলের সমর্থনে আসা না আসায়। এই দিক দিয়া এত দিনের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন বিপ্লবের প্রস্তুতি হিসাবে ব্যর্থ হইয়াছে। যে এ, আই, টি, ইউ, সি ভারতীয় শ্রমিক শ্রেণীর হইয়া শতকরা নিরানব্বইটির বেশী মজুরী বৃদ্ধি কিংবা ঐ জাতীয় অর্থ-নৈতিক আন্দোলন পরিচালিত করিয়াছে, সেই প্রতিষ্ঠানই যখন রাজনৈতিক প্রশ্নে সংগ্রামের আবেদন জানায় শ্রমিক-কে, শ্রমিক তাহা শুনে না—রাজনৈতিক

দুর্গা মুখার্জি

কারণে সাধারণ ধর্মঘটের আহ্বান সম্পূর্ণ-রূপে বিফল হয়। শাসক ধনিক শ্রেণী বামপন্থীদের সংগ্রামের ফল ভোগ করে।

শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে বিভেদ—

বামপন্থীদের এই দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করিতে ভারতবর্ষের পুঁজি-পতিরা এতটুকুও ভুলেন নাই। ধীরে ধীরে শ্রমিক শ্রেণীকে বামপন্থী শক্তি-গুলির নিকট হইতে সরাইয়া আনিবার উদ্দেশ্যেই আই, এন, টি, ইউ, সির জন্ম। ধনিক শ্রেণীর হাতে আজ রাষ্ট্রক্ষমতা, প্রচার শক্তি তাহার প্রচুর শক্তিশালী। এই প্রচারের মারফত তাহারা শ্রমিক শ্রেণীকে ভুল বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছে। ইহার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে প্রত্যক্ষ রাষ্ট্রশক্তি। যতগুলি মজুর আন্দোলন আই, এন, টি, ইউ, সি কে বাদ দিয়া পরিচালিত হইয়াছে তাহার অধিকাংশ-গুলিতেই পুলিশ আসিয়া হস্তক্ষেপ করি-য়াছে, শ্রমিক ইউনিয়নের নেতাদের ধরিয়া লইয়া গিয়াছে, ইউনিয়নের অফিস তালা বন্ধ করিয়া দিয়াছে, শ্রমিকদের মধ্যে বিভ্রান্তি ও বিভেদ বাড়াইয়া তুলিয়াছে। কিন্তু শুধু ইহা দ্বারা শ্রমিককে দলে টানা যায় না—এই কথাটিও ওই সব পুঁজি-বাদী রাষ্ট্রের দালাল শ্রমিক নেতাদের

(৬ষ্ঠ পৃঃ দেখুন)

★ বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদের উচ্ছেদের

নীহার মুখার্জ্জি

মানবের অগ্রগতির ইতিহাস শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস। যুগে যুগে কালে কালে বিভিন্ন দেশে কতই না বিদ্রোহ জ্বলিয়া উঠিয়াছে, বিপ্লবের অগ্নিশিথায় অসংখ্য রাজ্যের উথান পতনের মধ্য দিয়া কত রাজা, মহারাজা, বাদশাহের দণ্ড শক্তি ও সৌভাগ্যের উচ্চ শিথর হইতে অপসারিত হইয়া অপরিচিত ও অপরিজ্ঞাত দলের মধ্যে মিশিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছে. কত অতি সাধারণ যশ, মান, প্রভাব, প্রতিপত্তি লাভ করিয়া ইতিহাসের পাতায় অমর হইয়া রহিয়াছে; ইহার ফলে কতই না সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক, অবস্থার ওলট পালট হইয়া গিয়াছে। এই পরিবর্ত্তনের মূল কারণ কিন্তু বিভিন্ন নয় শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে শোষিত শ্রেণীর সংগ্রামই এই সব পরিবর্ত্তনের একমাত্র কারণ। শ্রেণীসংগ্রাম ও তাহার সমন্বয়ের মধ্য দিয়াই আগাইয়া চলিয়াছে মানব সমাজ; মানুষের জয় যাত্রার পথও তাই বিপ্লবের পথ। প্রত্যেক বিপ্লবের ধ্বনিও তাই ছিল শোষণকে শেষ করিবার আহ্বান। তবুও পৃথিবীতে আজপর্যান্ত যতগুলি বিপ্লব সংঘটিত হইয়াছে তাহার মধ্যে কেবল মাত্র একটি ব্যতীত প্রত্যেকটিতে শোষণকে দূর করিবার পরিবর্ত্তে নূতন করিয়া শোষণের বোঝা চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে। যাহারা একদিন বিশেষ ধরণের শোষণের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে লইয়া লড়িয়াছে, সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়াছে তাহারাই আবার ক্ষমতা পাইয়াই নূতন শ্রেণী সম্বন্ধের ভিত্তিতে নূতন করিয়া শোষণব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করিয়াছে—তাই শোষকের জাতি ও গোত্র বদলাইলেও শোষণের অবসান ঘটে নাই। ক্রীতদাসের মুক্তি সংগ্রাম হইতে আরম্ভ করিয়া, ভূমিদাসের বিদ্রোহ এমন কি গত শতাব্দীর গণতান্ত্রিক বিপ্লবগুলি পর্য্যন্ত সর্বত্রই ইতিহাসের সেই এক ধারা—পুরাতন শোষণব্যবস্থার স্থলে নূতন শোষণ যন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। কিন্তু কেবলমাত্র যে একটি বিপ্লব ইতিহাসের গতানুগতিক এই ধারাকে অস্বীকার করিয়া চিরতরে শোষণের মূলোৎপাটন করিয়া শোষিত ও নিপীড়িত শ্রেণী উপশ্রেণীগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিপ্লবী শ্রেণী সর্বহারার একনায়কত্বে বিশ্বে সম্পূর্ণ নূতন এক শোষণহীন শ্রেণীহীন সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা গড়িয়া তুলিবার পথ খুলিয়া দিয়াছে তাহা রাশিয়ার নভেম্বর বিপ্লব। ইহার মধ্য দিয়াই প্রকাশিত হইয়াছে বিশ্ব পুঁজিবাদের ঐতিহাসিক পরিনতি, নিশ্চিৎ ধ্বংসের ইঙ্গিত আর বিশ্বের সর্বহারা শোষিত জনগণের মুক্তির প্রতিশ্রুতি, ইহার মধ্য দিয়াই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বিশ্ব পুঁজিবাদের মারণ অস্ত্র, সর্বহারার মুক্তি আন্দোলনের বাস্তব রূপ, ইহার মধ্য দিয়াই ধ্বংস পাইতেছে গোটা বিশ্বের জীর্ণ পুরাতন অচল সমাজব্যবস্থা আর গড়িয়া উঠিতেছে শোষিত জনমানবের নূতন সংগ্রাম কৌশল, সংগ্রামের নূতন সাংগঠনিক রূপ। এই কারণেই নভেম্বর বিপ্লব শুধু রাশিয়ার জাতীয় পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, ইহা আন্তর্জাতিক বিপ্লবের প্রস্তুতি ও অঙ্গ। সারা দুনিয়ার শোষিত জনসাধারণ তাই নভেম্বর বিপ্লবকে অভিনন্দন জানায়, তাহাকে নিজের মুক্তির পথ মনে করে।

সর্ব্বহারা শ্রেণীর প্রথম জয়—বিশ্বপুঁজিবাদের নিশ্চিত ধ্বংসের সূচনা :—

বিশ্বপুঁজিবাদের যে শৃঙ্খল সারা দুনিয়াকে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল নভেম্বর বিপ্লব সে শৃঙ্খল পৃথিবীর এক ষষ্টাংশ হইতে অপসারিত করার ফলে অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশেও তাহার মুমূর্ষু অবস্থা প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। পুঁজিবাদী দেশগুলির মধ্যে অন্যতম রাশিয়ার বুর্জোয়া শ্রেণীকে উৎথাত করিয়া শোষিত জনসাধারণ নিজেদের রাষ্ট্র সর্বপ্রথমে কায়েম করিয়া প্রমান করিয়া দিয়াছে পুঁজিবাদী রাশিয়ায় যাহা সম্ভব হইয়াছে অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশে তাহা শুধু সম্ভবই নয়, অবশ্যম্ভাবী ও বটে। এই চেতনা সমগ্র বিশ্বের শোষিত শ্রেণী উপশ্রেণীগুলির মনে নূতন প্রেরণা দান করিয়াছে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে শ্রেণীসংগ্রামে। ইহারই ফল স্বরূপ সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদী দেশগুলিতে উত্তরোত্তর শ্রমিক শ্রেণীর প্রভাব বৃদ্ধি, তাহাদের ক্রমবর্দ্ধমান অগ্রগতি এবং সোভিয়েট রাষ্ট্রের প্রতি তাহাদের অকুণ্ঠ সহানুভূতি ও সাহায্য সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদের ভিত্তিমূলে প্রতিদিন কঠিন হইতে কঠিনতর আঘাত হানিয়া চলিয়াছে।

উপরন্তু শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্বে শোষক শ্রেণীকে অপসৃত করিয়া শোষিত শ্রেণী যে নূতন সমাজব্যবস্থা গড়িয়া তুলিয়াছে সোভিয়েট ইউনিয়নে তাহা সম্পূর্ণ এক অভিনব ব্যবস্থা। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে পুরাতনের সহিত তাহার কোথাও মিল নাই—এ দেশে শোষণ নাই, দুঃখ দৈন্য অনটন নাই, না আছে এতদিনের উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির মত নিত্যনব অর্থনৈতিক বিপর্যয়, দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ, বেকার সমস্যার চাপে পিষ্ঠ মানুষ এবং মনুষত্বের অপ-মৃত্যু। নভেম্বর বিপ্লব এক নূতন যুগের পত্তন করিয়াছে। এ যুগ মুষ্টিমেয় ব্যক্তির মুনাফার উদ্দেশ্যে শোষিত জনমানবকে মুক্ত করিবার যুগ, জমিদার ও পুঁজিপতিদের হাত হইতে উৎপাদন যন্ত্র কাড়িয়া লইয়া তাহাকে সমাজের সম্পত্তিতে পরিণত করিবার যুগ, পুঁজিবাদী শাসন ব্যবস্থায় তথাকথিত গণতান্ত্রিক পার্লামেণ্টারী শাসনের উচ্ছেদ ঘটাইয়া প্রকৃত গণতন্ত্র, সর্বহারার গণতন্ত্রের প্রতীক সোভিয়েট রাষ্ট্রব্যবস্থা চালু করার যুগ, যাহা কিছু পুরাতন ও বুর্জোয়া তাহাকে নিশ্চিহ্ন করিয়া নূতনভাবে সমাজতান্ত্রিক মতে গড়িয়া তুলিবার যুগ—এক কথায় সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদী দেশে সর্বহারা বিপ্লবের যুগ আনিয়া দিয়াছে নভেম্বর বিপ্লব।

● উপনিবেশগুলিতে মুক্তি ● আন্দোলনের রূপ ও বদলাইয়া দিয়াছে

শুধু নিজের দেশে শ্রমিক শ্রেণীর অগ্রগতি সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদী শক্তিগুলিকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলে নাই, সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদের বাকি অংশ উপনিবেশ ও অর্দ্ধ উপনিবেশগুলির মুক্তি আন্দোলনে মরণোন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে। অত্যাচারিত ও শোষিত জাতিগুলিকে মুক্তি দিতে না পারিলে সর্বহারা শ্রেণী নিজেই মুক্ত হইতে পারে না কারণ এই ঔপনিবেশিক শোষণই সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদের প্রধান শক্তি এবং এই প্রধান শক্তি অক্ষুন্ন থাকিলে পুঁজিবাদকে ধ্বংস করা কষ্টকর। অথচ পুঁজিবাদ বাঁচিয়া থাকিলে সর্বহারা মুক্তি পাইতে পারে না। এই কারণেই রাশিয়ার সর্বহারা শ্রেণী নিজের দেশের জমিদার ও পুঁজিপতিদের নিকট হইতে রাষ্ট্রক্ষমতা কাড়িয়া লইয়াই ক্ষান্ত হইতে পারে নাই, যে বিরাট জাতি সমূহকে রাশিয়ার পুঁজি

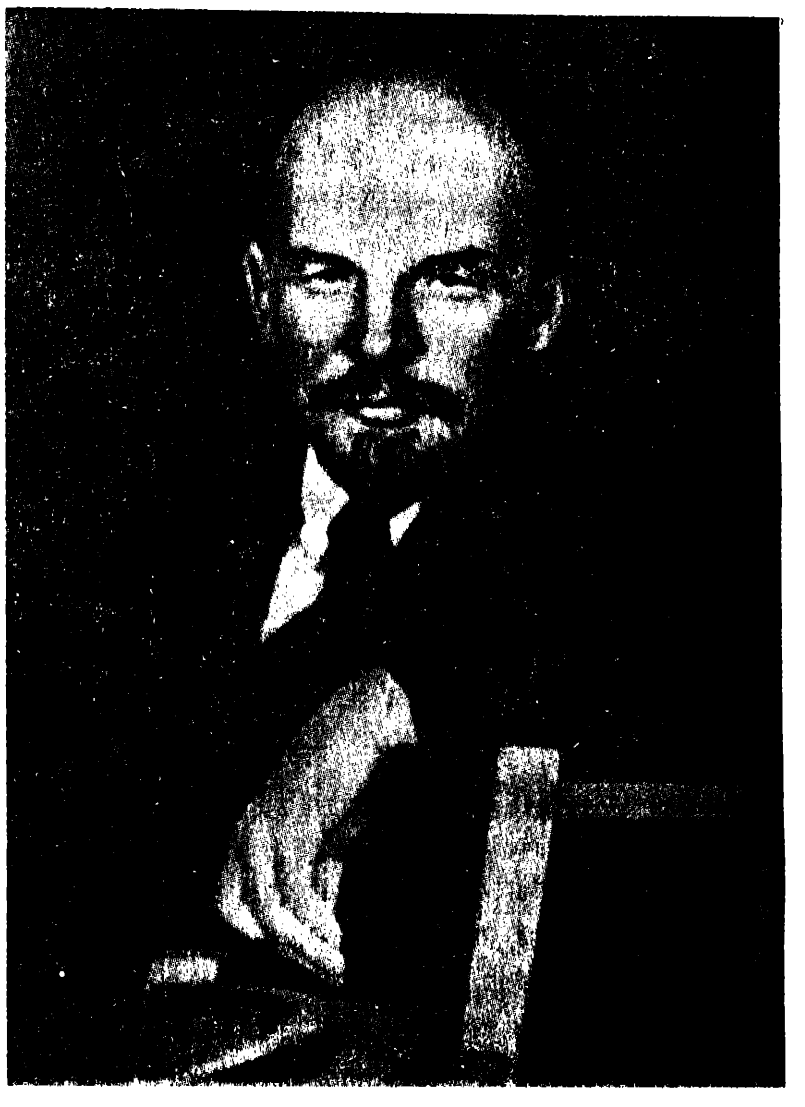

পথে প্রথম অভিযান—নভেম্বর বিপ্লব ★

বাদী ব্যবস্থায় দাস হিসাবে বাঁধিয়া রাখা হইয়াছিল জাতীয় ও ঔপনিবেশিক শোষণের বন্ধনে তাহাদিগকেও সম্পূর্ণ মুক্ত করিয়া দিয়াছে। ফলে পূর্ব্বে যেখানে জাতীয়-বিদ্বেষ জিয়াইয়া রাখিয়া বাধ্যতামূলকভাবে শোষণের ক্ষেত্রে বাঁধিয়া রাখা হইত এইসব জাতিগুলিকে আজ তাহার স্থলে গড়িয়া উঠিয়াছে পারস্পরিক বিশ্বাস ও প্রকৃত সৌহার্দ! এতদিনের নিপীড়িত জাতিগুলি প্রকৃতই স্বাধীনতার স্বাদ পাইয়াছে তাই জোর করিয়া বাঁধিয়া রাখিতে হয় নাই, তাহারা স্বেচ্ছায় নিজেদের সোভিয়েটের সহিত যুক্ত রাখিয়াছে। রাশিয়ার শোষিত জনসাধারণ শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে জাতীয়তার ভিত্তিতে না লড়িয়া আন্তর্জাতিকতার নীতিতে সংগ্রাম করিয়াছিল বলিয়াই জাতীয় সমস্যার তাহারা এত সুষ্ঠু সমাধান করিতে পারিয়াছে।

নভেম্বর বিপ্লবের এই আন্তর্জাতিক ভিত্তি সমগ্র উপনিবেশের মুক্তিকামী জনতাকে নূতন পথ দেখাইয়াছে। তাহারা পরিষ্কারভাবেই বুঝিয়াছে সোভিয়েট রাষ্ট্র ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার অবসান চায়; প্রতিটি ঔপনিবেশিক মুক্তি আন্দোলনের মিত্র সোভিয়েট ইউনিয়ন তাই প্রতি দেশের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শক্তি ও তাহাকে মিত্রের পর্য্যায়ে ধরে। সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েট ও উপনিবেশ, অর্দ্ধ উপনিবেশের মুক্তি আন্দোলনকে সর্বতোভাবে সাহায্য করিবার আকাঙ্খা ঘোষণা করিয়াছে। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সাহায্য, নভেম্বর বিপ্লবের পর উপনিবেশে শ্রমিক শ্রেণীর অগ্রগতি জাতীয় মুক্তি আন্দোলন গুলির রূপ ও চরিত্রের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়াছে। এতদিন ধরিয়া উপনিবেশ ও অর্দ্ধ উপনিবেশ গুলির মুক্তি আন্দোলন জাতীয়তাবাদের পথ ধরিয়া বুর্জোয়া-শ্রেণীর নেতৃত্বেই পরিচালিত হইত ধনতন্ত্রের প্রসার লাভ, ধনতান্ত্রিক সমাজ গঠন এবং ধনতান্ত্রিক স্বৈরতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য লইয়া, কিন্তু একচেটিয়া পুঁজিবাদের দিনে বিশেষ করিয়া নভেম্বর বিপ্লবের পর হইতে ধনিক শ্রেণী প্রকৃতই বুঝিয়াছে তাহাদের দিন শেষ হইয়া আসিতেছে ফলে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে তাহারা সংগ্রামী ভূমিকার পরিবর্ত্তে সাম্রাজ্যবাদের সহিত আপোষ কামীর ভূমিকাই গ্রহণ করে এবং বিপ্লবী আন্দোলনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া নিজের শ্রেণীস্বার্থ বজায় রাখিতে চেষ্টা করে। কিন্তু সংগ্রামী জনসাধারণ নিজের মুক্তির উদ্দেশ্যেই জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে তাহার স্বাভাবিক পরিণতির পথে চালিত করিতে চায় এবং এই জন্য শোষিত শ্রেণী উপশ্রেণীগুলির মধ্যে সম্পূর্ণ আপোষবিরোধী এবং সর্বাপেক্ষা বিপ্লবী যে শ্রমিক শ্রেণী তাহারই নেতৃত্বে চলিয়া আসিতে বাধ্য সেই আন্দোলনগুলি। সুতরাং উপনিবেশ ও অর্দ্ধ উপনিবেশগুলিতে যে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত হইতেছে বা হইবে তাহার নেতৃত্ব স্বভাবতই শ্রমিক শ্রেণীর উপর আসায় তাহাদিগকে আর বিশ্বধনতন্ত্রের মিত্ররূপে দেখা চলিতে পারে না, তাহারা বিশ্বসমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অংশে রূপান্তরিত হইতে বাধ্য। এই দিক দিয়া সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদীরা উপনিবেশ বা অর্দ্ধ উপনিবেশের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের শত্রু এবং আন্তর্জাতিক শ্রমিক শক্তি তাহার মিত্র হিসাবেই আসিবে। এইরূপে নভেম্বর বিপ্লব ঔপনিবেশিক মুক্তি আন্দোলনের এক নূতন যুগ আনিয়া দিয়াছে—সর্বহারা শ্রেণীর নেতৃত্বে চালিত পাশ্চাত্য দেশের শ্রমিক শ্রেণী হইতে প্রাচ্যের নির্য্যাতিত জাতি সমূহকে লইয়া একটি বিরাট বিপ্লব শৃঙ্খল রচিত হইয়াছে; জাতীয় মুক্তি আন্দোলন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অংশ হিসাবেই জন্ম লইয়াছে।

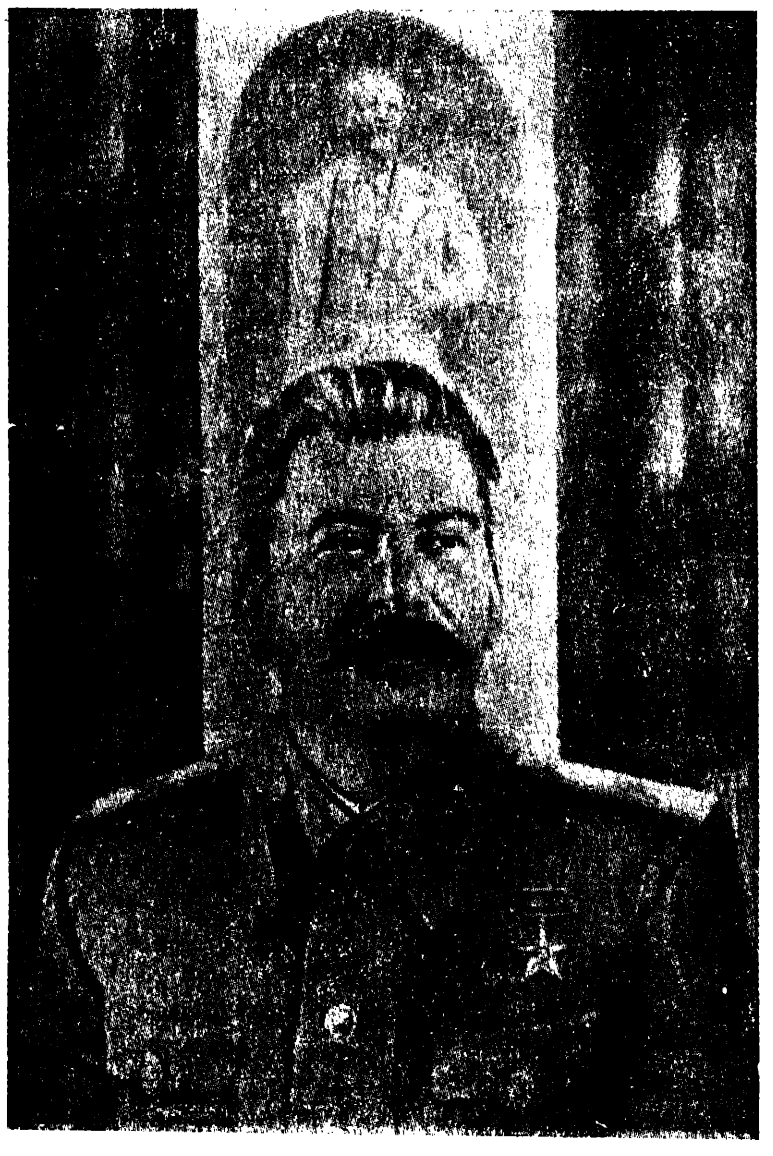

সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে বিপ্লবের শক্তিশালী কেন্দ্র স্থাপিত করিয়াছে:—

অসম বিকাশ, পুঁজির অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব ও তাহার ঐতিহাসিক পরিণতি হিসাবে যে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে পুঁজিবাদী দেশগুলি মাতিয়া উঠে নিজেদের মধ্যে, অর্থনৈতিক বিপর্য্যয়ের হাত হইতে কাটিয়া উঠিতে তাহার মধ্যেই পুঁজিবাদের মৃত্যু ঘটিয়া উঠিবে। পুঁজিবাদের উন্নততম অবস্থা সাম্রাজ্যবাদ আর সাম্রাজ্যবাদই পুঁজিবাদের মুমূর্ষরূপ। তাহার মধ্যাস্থিত বিরুদ্ধ শক্তি তাহাকে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকেই ঠেলিয়া লইয়া যাইতেছে—সোভিয়েট রাষ্ট্রের উপস্থিতি সেই কাজকে দ্রুততর করিয়াছে ও করিতেছে সন্দেহ নাই। অগ্রগতি যাহার স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে পতন তাহার আরম্ভ হইয়াছে বলিতে হইবে। বিংশ শতাব্দীতে পুঁজিবাদের আর অগ্রগতির পথ নাই। কিন্তু নভেম্বর বিপ্লবের পূর্ব্বে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধ শক্তি সমাজতন্ত্রের কোন প্রকাশ্য কেন্দ্র না থাকা সত্ত্বেও যখন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সফল হইয়াছে একটি পুঁজিবাদী দেশে তখন সোভিয়েট রাশিয়ায় বিশ্বের বৈপ্লবিক আন্দোলন পরিচালনার একটি শক্তিশালী ও প্রকাশ্য কেন্দ্র স্থাপিত হওয়ায় প্রতিটি দেশের শোষিত জনতার আশা আকাঙ্খা রূপ দিবার একটি নূতন উপায় বাহির হইয়াছে। বিশ্বের শোষিত শ্রেণী উপশ্রেণী আজ আর একা নয় একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র তাহাদের পশ্চাতে।

সংস্কারবাদ ও সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে লেনিনবাদের জয়

নভেম্বর বিপ্লব শুধু রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্ত্তনই সাধন করে নাই চিন্তার ক্ষেত্রে ইহা এক বিরাট সাফল্য লাভ করিয়াছে। দ্বিতীয় আন্তর্জ্জাতিকের অধীনে সোস্যালডিমোক্র্যাট দলগুলি মার্কসবাদের নামে যে সংস্কারবাদ ও সুবিধাবাদের নীতি গ্রহণ করিয়া কার্য্যতঃ বুর্জোয়া শ্রেণীর লেজুড় হিসাবে চলিতেছিল, নভেম্বর বিপ্লব মার্কসবাদকে সোস্যাল ডিমোক্র্যাসির সুবিধাবাদ হইতে মুক্ত করিয়া তাহাকে বৈপ্লবিক ভিত্তির উপর দাঁড় করাইয়াছে, সাম্রাজ্যবাদের যুগে মার্কসবাদের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ও তাহার যৌক্তিযুক্তিকতার বাস্তব প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছে। দ্বিতীয় আন্তর্জ্জাতিকতার যুগে সোস্যাল ডিমোক্র্যাটরা সর্বহারার একনায়কত্বের কথা মুখে অস্বীকার না করিয়াও কার্য্যে তাহারা যাহা করিত তাহাতে সর্বহারার একনায়কত্বে শোষিত জনসাধারণের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা প্রমাণিত হওয়া দূরে থাকুক, তাহার বিরুদ্ধতাই প্রকাশ পাইত। বুর্জোয়া চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবিত উদারনৈতিক বুর্জোয়া মতবাদই—সোস্যাল ডিমোক্র্যাসির আসল রূপ অথচ সেই সোস্যাল ডিমোক্র্যাসিই মার্কসবাদের সহিত এক ও অভিন্ন হইয়া গিয়াছিল—মার্কসবাদের বিপ্লবী ভাবাদর্শের কোন স্থানতখন ছিল না। কিন্তু নভেম্বর বিপ্লবের পর যখন সাম্রাজ্যবাদের যুগে মার্কসবাদের একমাত্র বৈজ্ঞানিক রূপ লেনিনবাদের নেতৃত্বে রাশিয়ায় প্রকৃতপক্ষে সর্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল তখন দ্বিতীয় আন্তর্জ্জাতিকের এই সব পণ্ডিত প্রবরদের

(১৬শ পৃঃ দেখুন)

ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন কোন পথে

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

জানা আছে তাই জাতীয় স্বার্থের জিগির তুলিয়া ধর্মঘটকে বে-আইনী করা হইতেছে যেমন এক দিকে অন্য দিকে তেমনই শ্রমিক দরদের অভিনয় চলিতেছে পুরাদমে। শ্রমিক খাইতে না পাইলে বাধ্য হইয়া ধর্মঘট করে। তাই যাহাতে ধর্ম্মঘটগুলি প্রকৃত শক্তিশালী হইয়া উঠিতে না পারে, শ্রমিকরা যাহাতে শ্রেণী সচেতন না হয় তাহার উদ্দেশ্যে কিছু কিছু অর্থনৈতিক সুবিধা করিয়া দেওয়া হইতেছে মালিকের সহিত আপোষ আলোচনার ভিতর দিয়া, আর যেখানে বদমেজাজী মালিক তাহার নিজের প্রতিষ্ঠান আই, এন, টি, ইউ, সির ধূর্ত্ত শ্রমিক-বিভেদকারী সূক্ষ্ম চাল বুঝিতে না পারিয়া গোঁড়া রক্ষণশীল উপায় গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মঘটকে ডাকিয়া আনে, তাহাকে ঠেকাইবার যখন আর কোন উপায়ই থাকে না তখন আই, এন, টি, ইউ, সির নেতারা শ্রমিকরো প্রস্তুত হইবার আগেই ধর্ম্মঘট আরম্ভ করিয়া দেন। তাহার পর নেতাদের বিশ্বাসঘাতকতা, শ্রমিকের প্রস্তুতির অভাবে ধর্ম্মঘটকে বিফল করিয়া দিয়া শ্রমিকের নিজেদের মধ্যকার সংহতি ও আত্মবিশ্বাসকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দেওয়া হয়। এই ভাবেই চলিতেছে আই, এন, টি, ইউ, সির, শ্রমিক দলন ভারতীয় পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের সমর্থন ও সহযোগিতায়।

শ্রমিক শ্রেণীর দালাল সোস্যাল ডিমোক্র্যাটরাও এই বিষয়ে পিছাইয়া নাই। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, জাতীয় স্বার্থ শ্রেণী স্বার্থ অপেক্ষা বড়, কম্যুনিষ্ট আতঙ্ক প্রচার করিয়া ভারতবর্ষের জয়প্রকাশী সমাজতন্ত্রীরা শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে বিভেদ বাড়াইয়া তুলিতেছে। বিপ্লবী রাজনীতি হইতে, শ্রমিককে দূরে সরাইয়া রাখিবার আপ্রান চেষ্টা করিতেছে। খাঁটি কংগ্রেস যেখানে আই, এন, টি, ইউ, সি গড়িতে পারে সেইখানে তাহারা চুপ করিয়া থাকিতে পারে না। জন্ম লইল "হিন্দ মজদুর পঞ্চায়েত"। মুখে সমাজতন্ত্রের কথা বলিয়াও শ্রমিক ইউনিয়ন গড়িবার মূলধন হইতেছে ইহাদের—প্রাদেশিকতা। বাংলা দেশে যেখানে বাঙ্গালী অবাঙ্গালী প্রশ্ন তুলিয়া লাভ হইবার সম্ভাবনা আছে সেই স্থলে তাহা চালান হইতেছে। আজ পর্য্যন্ত ইহাদের আই, এন, টি, ইউ, সির সহিত সর্বরকমের সহযোগিতা;—ধর্ম্মঘট বিরোধী কার্য্যাবলী হইতে আরম্ভ করিয়া জঙ্গী শ্রমিক ইউনিয়নকে ভাঙ্গিবার জন্য পুলিশের হইয়া গুপ্তচরের কাজ করা পর্য্যন্ত—ইহাদের রূপ ভালভাবে প্রকাশ করিয়া দিয়াছে। কিন্তু তথাপি ইহাদের সম্বন্ধেই অধিকতর সচেতন হইতে হইবে। নগ্ন ফ্যাসিবাদী কংগ্রেসী শাসনের রূপ এবং তাহার নানা সংগঠনের আসল চরিত্র ভারতীয় জনসাধারণকে বেশী দিন ধোকা দিতে পারিবে না। জনশক্তি নগ্ন অত্যাচার সহজেই বুঝিতে পারে কিন্তু বিশ্বপুজিবাদী শক্তির সর্বাপেক্ষা কৌশলী-শক্তি সোস্যাল ডিমোক্র্যাসির শোষণ অত সহজে বুঝিবার নয়। সুতরাং ইহাদের আসলরূপ জনসমক্ষে আরও ভালভাবে প্রকাশ করার প্রয়োজন আছে।

এ, আই, টি, ইউ, সির দুর্ব্বলতা।

শ্রমিক আন্দোলনের এই সঙ্কটপূর্ণ অবস্থায় যেখানে প্রত্যেকটি বামপন্থীদলের মধ্যে সংগ্রামী ঐক্যফ্রন্ট গঠন করিয়া ধনিক শ্রেণীর আক্রমন হইতে শ্রমিক ফ্রন্টকে রক্ষা করা একমাত্র কর্ত্তব্য সেইখানে কয়েকদিন আগে পর্য্যন্তও সমানে চলিয়াছে নীচে হইতে সংগ্রামের ভিত্তিতে ঐক্য গড়িয়া তুলিবার পরিবর্ত্তে উপর হইতে বিভিন্ন দলের বোঝাপড়ার মারফৎ ঐক্য গড়ার চেষ্টা। শ্রমিক ক্ষেত্রে প্রকৃতই কোন দলের বাস্তব প্রভাবপ্রতিপত্তি আছে কিনা তাহা বিচার না করিয়া নামের উপরই জোর দেওয়া হইয়াছে শুধু মাত্র দলীয় স্বার্থের প্রয়োজনে। যে বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দলকে প্রতিটি ক্ষেত্রে ঐক্য-ভঙ্গকারী বলিয়া দেখা গিয়াছে তাহাদের শ্রমিক ক্ষেত্রে কতটুকু বাস্তব প্রভাব আছে তাহা বিচার না করিয়াই এ, আই, টি, ইউ, সি তে অধিক আসন দেওয়া হইয়াছে অথচ যাহারা প্রকৃতই ঐক্যকামী এবং শ্রমিক ক্ষেত্রে বেশ কিছু শক্তিশালী এবং শ্রমিক শ্রেণীকে সঠিক রাজনৈতিক চেতনা সম্পন্ন করিতে সক্ষম তাহাদিগকে ঠেকাইবার জন্যই সকল রকম চেষ্টা হইয়াছে। ইহাকে প্রকৃত ঐক্য গড়ার চেষ্টা বলে না। অথচ সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থের প্রয়োজনে যেখানে শুধুমাত্র উপর হইতে আলাপ আলোচনা চালাইয়া ঐক্য গড়ার চেষ্টা হইয়াছে সেখানে ঐক্য প্রচেষ্টার এই জঘণ্য ব্যর্থতার দায়িত্ব লইতে কম্যুনিষ্ট পার্টি আজ অস্বীকার করিতেছে। আর এই ব্যর্থতার অভিজ্ঞতাকেই একমাত্র সম্বল করিয়া অসামাবাদী বামপন্থী শক্তিগুলির মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনকে অস্বীকার করিলে বা সে সম্বন্ধে নৈরাশ্য প্রকাশ করিলে এক ধরণের পরাজিত মনোভাবেরই পরিচয় দেওয়া হইবে যাহাকে একমাত্র "বুর্জোয়া এসকেপিষ্ট"দের সাথেই তুলনা করা চলে। কমিউনিষ্ট পার্টি যদি তাহাদের পূর্ব্বোক্ত বিভ্রান্তির সবটুকু দায়িত্ব আজ একমাত্র বিভেদকারীদের ঘাড়েই চাপাইয়া দিতে চায় তাহা হইলে নূতন করিয়া ঐক্য গড়ার সম্ভাবনা একেবারে লুপ্ত হইয়া যাইবে এবং আগামী বিপ্লবের প্রস্তুতিকে তাহা অনেকাংশে দুর্বল করিয়া দিবে। কমিউনিষ্ট পার্টিই বিপ্লবের একমাত্র শক্তি, একাই সে বিপ্লব করিবে, বামপন্থীদের তাহাদের সাথে আনিবার প্রয়োজন হইবে না, এই ধারণা কমিউনিষ্ট পার্টিকে মারাত্মক উত্তেজনামূলক বিভ্রান্তির পথে টানিয়া লইয়া যাইবে, জনতাকেও অযথা অসময়ে প্রকৃত প্রস্তুতির আগেই খণ্ড খণ্ড ভাবে সরকারের সঙ্গে মুখোমুখি সংগ্রামে ঠেলিয়া দিবে, যাহার জের সামলাইতে বিপ্লবী আন্দোলনের অনেক ক্ষতি স্বীকার করিতে হইবে।

জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন ও হিন্দ মজদুর পঞ্চায়েতের বিভেদের চক্রান্ত ব্যর্থ করিতে হইলে চাই—
এ, আই, টি, ইউ, সির—ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট
শ্রমিকের অর্থনৈতিক সংগ্রামকে রাজনৈতিক রূপ দিবার চেষ্টা
বিপ্লবী মার্কসবাদ লেনিনবাদের বিশেষ প্রচার।

কম্যুনিষ্ট পার্টির মারাত্মক ভুল

এ, আই, টি, ইউ, সির এই ব্যর্থতার জন্য অনেকাংশে দায়ী কম্যুনিষ্ট পার্টি। তাহারাই প্রচুর সংখ্যাধিক্যের জোরে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসকে পরিচালিত করিতেছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বিশ্বের সামাজিক শ্রেণী বিন্যাসের সহিত ভারতবর্ষের বিভিন্ন বামপন্থী দলগুলির সম্বন্ধ এবং বিশ্ব পুঁজিবাদ ও বিশ্ব সমাজতন্ত্রের মধ্যে আগামী তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধে তাহাদের কাহার নিকট হইতে কি এবং কতটুকু সাহায্য পাওয়া যাইবে তাহারই দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই ঐক্যের কথা ভাবিতে হইবে। যাহারা মার্কস, এঙ্গেলেস, লেনিন ও ষ্টালিনের চিন্তায় বিশ্বাস করে তাহাদিগের মধ্যে ঘনিষ্ঠতর ঐক্য গড়িয়া তুলিতে হইবে broad based গণতান্ত্রিক ঐক্য ফ্রন্ট গড়িবার জন্য। কিন্তু সে চেষ্টা কম্যুনিষ্ট পার্টির মধ্যে নাই। তাহারা আজ পর্য্যন্ত কার্য্যতঃ ইহার বিরোধিতা করিয়া হয় ট্রট্স্কিবাদ প্রভাবিত দলকে নয় কোন দলভুক্ত নয় এমন ব্যক্তি বিশেষকে সম্মুখে রাখিয়াছে ট্রেডইউনিয়ন কংগ্রেসের। গণতান্ত্রিক ঐক্য ফ্রন্ট গঠনের স্বপ্নে তাহারা শত্রুমিত্র চিনিতে পারে নাই—ইহা যে দল নিজেকে শ্রমিক শ্রেণীর দল বলিয়া পরিচয় দেয় তাহার পক্ষে লজ্জার কথা। আর বর্ত্তমানে কম্যুনিষ্ট পার্টি মুখে গণতান্ত্রিক ঐক্য ফ্রন্টের কথা বলিলেও নিজেদের দলীয় ফ্রন্টই ঐক্য ফ্রন্ট এই অবাস্তব চিন্তা করিতেছে। কারণ তাহা না হইলে যেখানে সামান্য আপোষের মধ্যে ঐক্য গড়িয়া তোলা সম্ভব সেইখানেও তাহারা দলীয় মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়া ঐক্যবদ্ধ হইতে চাহিতেছে না। ফল ইহার যাহা হইবার তাহাই হইয়াছে। একদিন যাহাদিগকে কম্যুনিষ্টদল মিত্রের পর্য্যায়ে ফেলিয়া প্রচার করিয়াছে চূড়ান্তভাবে তাহারা হয় এ, আই, টি, ইউ, সি হইতে সভ্যপদ ত্যাগ করিয়াছে নয় কম্যুনিষ্ট বিরোধী ফ্রন্টে গড়িতে যাইতেছে।

বাঁচিবার উপায়

আই, এল, ও বস্ত্রশিল্প কমিটিতে এক জন প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করার ব্যাপারে যে ঘটনা হইয়া গেল তাহাতে ভারতবর্ষের শ্রমিক সংহতি আরও নষ্ট হইল। এই বিভেদের ফলকে ভারতীয় পুঁজিপতিরা ভালভাবেই কাজে লাগাইতে চেষ্টা করিতেছে। সাকসেনার চিঠি হইতে প্রমাণ হইয়াছে ভারতীয় ধনিক শ্রেণী এ, আই, টি, ইউ, সিকে ভিতর হইতে ধ্বংস করিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছিল। এই গোপন চেষ্টা প্রকাশ হইবার পর বিভিন্ন বামপন্থী দলগুলির মধ্যে যাহাতে ঐক্য ফ্রন্ট আর কিছুতেই গড়িয়া না ওঠে তাহার জন্য ধনিক শ্রেণীর প্রচার আরম্ভ হইয়া গিয়াছে ইতিমধ্যে—এন, এম, যোশী প্রমুখ এ, আই, টি, ইউ, সিরনেতাদের আই, এন, টি, ইউ, সিতে যোগ দিবার জন্য আহ্বান জানান হইয়াছে অন্যদিকে কম্যুনিষ্ট পার্টি বিরোধী ফ্রন্ট এ, আই, টি, ইউ, সির মধ্যে গড়িয়া উঠিতেছে। এইভাবে শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে বিভেদ বাড়িয়াই যাইতেছে। ইহাকে বন্ধ করিতেই হইবে। তাহার জন্য কম্যুনিষ্ট পার্টির দায়িত্ব সর্ব্বাপেক্ষা বেশি। তাহাদের ব্যবহারে প্রমাণ করিতে হইবে তাহারা প্রকৃত গণতান্ত্রিক ঐক্য ফ্রন্ট গঠনের প্রয়াসী।

এ, আই, টি, ইউ, সির মধ্যে সেই ঐক্যবদ্ধতা শ্রমিকদের মধ্যে যাহাতে রাজনৈতিক সচেনতা বাড়ে, যাহাতে মধ্যবিত্ত শ্রেণী উপশ্রেণীকে শ্রমিকের পাশে টানিয়া আনা যায়, যাহাতে কংগ্রেসী সরকার ও নেতাদের মিথ্যা স্তোক বাক্যে জনসাধারণ বিশেষ করিয়া শ্রমিক শ্রেণী বিশ্বাস না করে তাহার জন্য চূড়ান্ত প্রচারের কাজে লাগাইতে হইবে। শ্রমিককে শ্রেণী সমন্বয়ের ফাঁদে ফেলিবার যে চেষ্টা হইতেছে তাহার প্রভাব হইতে তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া শ্রেণী সংগ্রামের মধ্য দিয়া তাহাদিগকে পুঁজিবাদ বিরোধী সচেতন শক্তিতে পরিণত করাই মূল লক্ষ্য হইবে। সেই দায়িত্ব বামপন্থী দলগুলী পালন করিতে না পারিলে সংগ্রামী জনসাধারণ আগাইয়া আসিবে ইহাতে কণামাত্র সন্দেহ নাই।

≡ ছাত্র আন্দোলনের গতি ও প্রকৃতি ≡

সুকোমল দাসগুপ্ত

ছাত্রজীবন ও রাজনীতি

আমাদের দেশের গোঁড়া রক্ষণশীলরা এই কথাটা প্রায়ই বলে থাকেন যে ছাত্রদের তপস্যাই হল অধ্যয়ন; সুতরাং পড়াশোনাই তারা শুধু করবে। এঁদের কথার প্রতিধ্বনি করে কংগ্রেসী বড়লাট ছাত্রদের রাষ্ট্রিক পুনর্গঠনে মন দিতে এবং নিজেদের জীবনের উন্নতি ও বিকাশের কাজে নিযুক্ত থাকতে উপদেশ দেন; জয়প্রকাশী সমাজতন্ত্রী নেতা ডাঃ রামমনোহর লোহিয়া তারই খেউড় হিসেবে ছাত্রদের নিন্দা করে বলেন—"একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে ছাত্ররা নিয়মানুবর্ত্তিতা শিক্ষা করেনি" (বাঙ্গালোর ছাত্র কংগ্রেসের অধিবেশনে বক্তৃতা)। রক্ষণশীল, শাসকগোষ্ঠি আর মুখে সমাজতন্ত্রী এই তিন দলেরই উদ্দেশ্য কিন্তু এক; ছাত্ররা নিয়মানুবর্ত্তী হয়ে লেখাপড়া করবে, প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে তারা দূরে থাকবে এ বিষয়ে এঁদের মধ্যে কোন দ্বিমত নেই—রক্ষণশীলতা আর জয়প্রকাশী সমাজতন্ত্রের চমৎকার মিল। কিন্তু সত্যই কি আজ কেউ,তা সে ছাত্রই হক বা শ্রমিক কিংবা কেরাণী হক, রাজনীতি থেকে দূরে থাকতে পারে? জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে রাজনীতি; জীবনকে বাদ দিতে পারলেই তবে রাজনীতি থেকে মুক্তি পাওয়া যেতে পারে তার আগে নয়। খাওয়া পরা থেকে আরম্ভ করে স্কুল কলেজ মায় পাঠাগারের সঙ্গেও মিশে আছে রাজনীতি। প্রদেশের কংগ্রেসী ছোটলাটেরা বক্তৃতা দেন—"ছাত্রছাত্রীদের শুধু লেখাপড়া করলে চলবে না, তাদের শরীর সবল করতে হবে" (ডাঃ কার্টজু)। খুব ভাল কথা কেউ অস্বীকার করবে না, কিন্তু কি খেয়ে ছাত্রছাত্রীরা স্বাস্থ্য সবল করবে? সরকারের জোহুকুম বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষদেরও যে মেনে নিতে হয়—"প্রয়োজনমত পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে এবং অস্বাস্থ্যকর স্থানে বসবাসের ফলে ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙ্গে পড়ছে" (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ওয়েল ফেয়ার কমিটির রিপোর্ট ১৯৪৪-৪৭ সাল)। কিন্তু কেন পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব ঘটে, কেনই বা অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাস করতে হয়, কি করলে এঅবস্থা থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়—এ কথাগুলি বৈজ্ঞানিক ভাবে চিন্তা করতে গেলেই রাজনীতিতে টান পড়ে আর উদ্ধারের কার্য্যকরী পন্থা গ্রহণ করলে ত কথা নেই। রাজাজী উৎসাহ দিয়ে বলেন—"ছাত্ররা, তোমরা নিষ্প্রদীপ দেশে আলো জ্বাল।" মাসিক ১লক্ষ ১০হাজার টাকা যাঁর জন্য খরচ হয় তাঁরত জানা নেই যে কেরোসিন তেলের অভাবে ছাত্রদের অন্ধকারেই বাস করতে হয়, সুন্দরবন অঞ্চলে ছেলেদের রাত্রে পাঠ অভ্যাস বন্ধ হয়ে গিয়েছে। আর জানলেই বা কি তিনিত উপদেশ দিয়েই তাঁর কর্ত্তব্য শেষ করলেন। তেলের আলো যাদের জ্বলেনা জ্ঞানের আলো তারা জ্বালাবে কোথা থেকে; তার ওপর সরকারী ব্যবস্থাও চমৎকার। কাগজ মেলেনা বাজারে; বাপ দাদারা বেকার, পড়ার খরচ চলেনা অথচ দিনের পর দিন সরকার ঘাটে—পারুলেকার কিংবা ঐ জাতীয় কোন পরিকল্পনার কথা বলে কিংবা শিক্ষকদের মাইনে বৃদ্ধির উপলক্ষ করে ছাত্রদের বেতনের হার বাড়িয়েই চলেছেন। কোন পরিকল্পনাই সুফল প্রসব করেনা শিক্ষকদের মাইনেও বাড়েনা। আধপেটা খেয়ে কায়ক্লেশে ছেলেমেয়েদের পড়াবার শেষ চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায় দরিদ্র ভারতবাসীর; সরকারের শিক্ষাবিভাগে ব্যয় মোট রাজস্বের শতকরা ৯ ভাগ থেকে শতকরা ৬ ভাগে নেমে আসে। নোতুন নোতুন মন্ত্রীর নিয়োগ হয়, নেতাদের মাইনে বেড়ে যায়, একটা মোটরগাড়ী থাকতেও ৫০ হাজার টাকা দামে আবার নোতুন গাড়ী আসে। কেন আসে, কি তার প্রতিকার? একেবারে খাঁটি রাজনৈতিক প্রশ্ন। আর যদি ছাত্ররা তাদের অসুবিধার প্রতিকার করতে সংঘবদ্ধ আন্দোলনই করে বসে তাহলে আসে পুলিশ, চলে লাঠি, গ্যাস, গুলি; রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আন্দোলনের অভিযোগে সোপার্দ হয় তারা। রাজনৈতিক অভিযোগ নেমে আসে। সুতরাং রাজনীতিকে ছাত্রজীবন থেকে বিদায় করার কথা বললে চলবে কেন?

নেতাদের বিশ্বাসঘাতকতা

বিদায় যে দেওয়া যায়না এ কথাটা নেতারা ভালভাবেই জানেন কিন্তু শ্রেণীস্বার্থের খাতিরে তাঁরা মানতে রাজী নন। নেতাদের স্বাধীন ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল-নেহেরু ১৯৩৬ সালে বলেছিলেন—"রাজনৈতিক আলোচনা ও আন্দোলন করার অধিকার প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর আছে। যদি প্রয়োজন হয় তাহলে ছাত্রসমাজকে প্রাণ দিয়ে এই পবিত্র অধিকার রক্ষা করতে হবে।" ইতিহাস প্রমান দেয় আজ পর্য্যন্ত ছাত্রসমাজ প্রাণ দিয়ে সে অধিকার রক্ষা করে আসছে। ভারতবর্ষের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে ছাত্রছাত্রীদের দান অবিস্মরণীয়; স্কুল কলেজ ত্যাগ করে লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রী ঝাঁপিয়ে পড়েছে আন্দোলনের আবর্ত্তে, কারাবাস, দ্বীপান্তর, ফাঁসি হাসিমুখে বরণ করে নিয়েছে। ভারতের বিপ্লবী আন্দোলনত ছাত্রদের অসীম সাহস ও ত্যাগে গড়ে উঠেছে। এইত সেদিনও যুদ্ধোত্তর যুগের গণ-আন্দোলন রামেশ্বর, আব্দাস সালামের বুকের রক্তে প্রথম রেঙ্গে উঠেছিল, ২১শে নভেম্বর ও রসিদ আলি দিবস ত বিপ্লবী ছাত্রসমাজের কীর্ত্তি। নেতাদের শ্রীমুখ থেকে তখন প্রশংসাই পেয়েছিল ছাত্রেরা। তারপর ১৫ই আগষ্টের পর দেশীয় ধনিক শ্রেণীর প্রতিভূ হিসেবে যখন নেতারা ক্ষমতা দখল করলেন তখনই একদিকে তাঁরা চেষ্টা করতে লাগলেন ছাত্রসমাজকে ভুল বুঝিয়ে রাজনীতির পথ থেকে ফিরিয়ে আনতে অন্যদিকে কঠোর দমননীতির ব্যাপক প্রয়োগে বিপ্লবী ছাত্রসমাজকে চূর্ণ করার ষড়যন্ত্র চলতে লাগল। ১৯৪৭ সালের ২১শে নভেম্বর আবার ছাত্রদের রক্তপাত দেখল তবে এবার ইংরাজ শাসকের হাতে নয়, দেশীয় জাতীয় নেতাদের লাঠিতে গুলিতে। রাতারাতি ছাত্রসমাজ নেতাদের কাছে উচ্ছৃঙ্খল দেশদ্রোহীদের পর্য্যায়ে নেম এল। ১৯৩৬ সালের কথা আজ কি নেহেরু সরকার মানতে প্রস্তুত আছেন? ভারতবর্ষের ফ্যাসিবাদী সরকার গুলি গ্যাস আর লাঠির মুখে এ প্রশ্নের জবাব দিয়েছে। যখনই ছাত্ররা তাদের প্রাথমিক দাবী দাওয়ার কথা বলতে গিয়েছে তখনই তাদের দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে চূড়ান্ত। কলিকাতা, বোম্বাই, লক্ষ্ণৌ মাদ্রাজ, দিল্লী—ভারতের সর্বত্রই এর পরিচয় পেয়েছে॥

সাম্রাজ্যবাদীর তাঁবেদার নেহরু প্যাটেল চক্র

সাম্রাজ্যবাদী বৃটীশ শাসনের কাল ছাত্রদের আমরণ সংগ্রাম, তাদের বিপ্লবী চেতনা জাতির গর্বের বিষয় বলে যে নেতারা ঘোষণা করেছিলেন তাঁরাই যখন আবার জনসাধারণের ত্যাগের ফলে অর্জ্জিত ক্ষমতা হস্তগত করতে সক্ষম হলেন, তখন সেই ছাত্ররাই তাঁদের কাছে হয়ে উঠল উচ্ছৃঙ্খল, দেশদ্রোহী। নিরীহ ছাত্রদের ওপর গুলি চালাবার জন্য যাঁরা বৃটীশ সাম্রাজ্যবাদকে জঘন্য ভাষায় আক্রমন করতে দ্বিধা করেননি তাঁরাই তার চেয়ে কম উত্তেজনার ব্যাপারে বিদেশী শাসকের চেয়ে আরও নির্ম্মমভাবে নিষ্পেষণ চালিয়েছেন, চালাচ্ছেনও। হিংসা অহিংসার প্রশ্ন তখন ওঠে না। গান্ধিজীর নৈষ্ঠিক ভক্ত হয়েও মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে নিরীহ শান্ত জনতার বুকের রক্ত টেনে বের করতে লজ্জা করে নাএই সব সত্য আর অহিংসার ধ্বজাধারীদের। এর কারণ কি? কারণ ভারতীয় জাতীয় নেতারা আসলে হলেন ঔপনিবেশিক ধনিক গোষ্ঠির প্রতিনিধি। পুঁজিবাদী শোষণ ব্যবস্থা কায়েম করতে এঁরা সব কিছুই করেন; অহিংসা এঁদের বাহ্যিক খোলোষ। সারা দুনিয়ার বর্ত্তমান চূড়ান্ত শ্রেণী সংগ্রামের দিনে জনসাধারণ এখন অনেক বেশী রাজনৈতিক সচেতন হয়ে উঠেছে, দেশে দেশে জাগ্রত গণশক্তির প্রভাবও অনেক বেশী বেড়ে গিয়েছে তাই পুঁজিবাদী শোষক আগে যেমন নির্লজ্জ ও নগ্নভাবে শোষণ করতে পারত, আজ আর তা পারেনা। পুঁজিবাদ তাই নোতুন পথ ধরেছে—**শোষণকে অব্যাহত রাখার জন্যই সে মাঝে মাঝে শোষিত শ্রেণী উপশ্রেণীগুলির জন্য দু চার ফোঁটা চোখের জল ফেলে, তাদের জন্য দু চারটা সংস্কারপন্থী ভাল কাজও করে নগ্ন শোষণ ব্যবস্থাকে তীব্র আক্রমন করে গণতন্ত্রের বা সমাজতন্ত্রের গুণগান করে।** এক কথায় মুখে সাম্য ও অহিংসার কথা বলে' জনসাধারণের দরদীর অভিনয় করে কৌশলে শোষণ করে চলে। এরাই হল পুঁজিবাদীদের মধ্যে বুদ্ধিমান—এরা জানে শুধু লাঠির জোরে শাসন ও শোষণ করার দিন শেষ হয়েছে তাই মিষ্টিকথায় কাজ উদ্ধার করতে চায় এরা। কিন্তু এদের অন্তর্নিহিত ফ্যাসিবাদী রূপ ঢেকে রাখতে পারা এদের পক্ষে অসম্ভব। তাই জনসাধারণ যখন এদের মিষ্টি কথার পেছনের আসল উদ্দেশ্য টের পেয়ে আন্দোলন আরম্ভ করে তখন বাহ্যিক মুখোস এদের খসে পড়ে ভেতরের আসল রূপ প্রকাশ হয়ে পড়ে। **হিটলার মুসোলিনী তোজো, চার্চিল, এটলি, ট্রুম্যানদের সঙ্গে প্যাটেল, নেহেরু, রায়, ঘোষদের মূলতঃ কোন প্রভেদ নেই প্রভেদ শুধু উগ্রতা আর শোষণের পথ নিয়ে।** মাউন্টব্যাটেনের কাছ থেকে 'ব্যাটন' চালাবার ভাল ভাল প্যাঁচ

[১০ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদ ও সামন্ততন্ত্র

মহাচীনের বৈপ্লবীক ঐতিহ্য

মহাচীনের যে কুয়োমিনটাঙবিরোধী মুক্তি আন্দোলন ২১ বছর ধরে চলছে তার গুরুত্ব যথেষ্ট; তাতে শুধু মহাচীনের ৪০ কোটী নরনারীর ভাগ্যই নির্ভর করছে না, সারা এশিয়ার নিপীড়িত শোষিত জনমানবের আশা, আকাঙ্খা, ভবিষ্যত তার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। কারণ সাম্রাজ্যবাদী সামন্ত-তান্ত্রিক ও দেশীয় পুঁজিবাদী শোষণ ও শাসণের বিরুদ্ধে দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার নবজাগ্রত গণশক্তি যে মুক্তি আন্দোলন আরম্ভ করে দিয়েছে দেশে দেশে, সেসব বিপ্লবী আন্দোলনের সমাপ্তির রূপ অনেকাংশে নির্ভর করছে মহাচীনের বিপ্লবের সাফল্য অসাফল্যের ওপর। সেই দিক দিয়ে চীনা জনসাধারণের আন্দোলন আজ মহাচীনের সীমা পার হয়ে মিশে গেছে ইন্দোনেশিয়া আর ভিয়েৎনাম, মালয় আর বর্মার গণ-অভ্যুত্থানের সঙ্গে; মহাচীনের শ্রমিক কৃষক নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণী উপশ্রেণী গুলির সংগ্রাম তাই মহা-চীনের একলার নিজস্ব সংগ্রাম নয়, তা আমাদেরও সংগ্রাম, সারা এশিয়া এমনকি সারা দুনিয়ার শোষিত মানুষের আপনার সংগ্রাম। এই সত্যকে লুকিয়ে জনসাধারণকে ভুল বুঝিয়ে আসল অবস্থা সম্বন্ধে অন্ধ রাখার চেষ্টা তাই চলছে সমস্ত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে; আমেরিকার ওয়ালষ্ট্রীট মহল থেকে, লণ্ডনের ডাউনিং ষ্ট্রীট হয়ে নয়াদিল্লীর সেক্রেটারিয়েটের তাই কত না চেষ্টা মহাচীনের এই অভ্যুত্থানকে "কম্যুনিষ্ট চক্রান্ত" "সন্ত্রাষবাদী স্বৈরাচার" এমনকি "কতকগুলি রুশ দালালের দেশকে রাশিয়ার হাতে তুলে দেবার চেষ্টা" বলে বোঝাতে। কিন্তু এশিয়ার মোট জন সংখ্যার এক চতুর্থাংশের মত লোক ইতিমধ্যেই শোষণের শৃঙ্খল আর দাসত্বের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে এই সব দেশের পণ্ডিত মুর্খদের ধাপপ্াবাজীকে মিথ্যা বলে প্রমান করে দিয়েছে, আরও দেবে মুক্তচীনের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে।

মুক্তিকামী চীনা জনসাধারণের বিপ্লবী নেতা
মাও সে টুঙ

বিপ্লবের ইতিহাস

প্রাচীন চৌ ও চীন বংশের শাসন কাল হতে গত শতাব্দী পর্য্যন্ত চীনের সামাজিক অবস্থা ও বনিয়াদ ছিল সামন্ততান্ত্রিক বনিয়াদ—রাজনীতি অর্থনীতি, সমাজনীতি, সবই চলত সামন্ততান্ত্রিক মতে। তার পর থেকে ১৮৯৪-৯৫ সালের চীনজাপানের যুদ্ধ পর্য্যন্ত চলে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শক্তি-গুলির—গ্রেটবৃটেন, জার্মানী, ফ্রান্স, জারের রাশিয়া, আমেরিকার — অনু-প্রবেশের যুগ। তখন থেকে চীনে ধন-তন্ত্রের প্রবেশ ও প্রসারের যুগ এবং এই সময়ের মধ্যে চীনের সমাজব্যবস্থা হয়ে ওঠে আধা—সামন্ততান্ত্রিক আধা-ঔপনিবেশিক। ১৮৯৪ সালের আগে পর্য্যন্ত সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি চুক্তি পত্রের জোরে চীনের বাজারটাই শুধু দখল করেছিল কিন্তু চীনজাপান যুদ্ধে চীনের পরাজয় এবং তার দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে তারা চীনের ওপর পাকা-পাকি ভাবে বসে কার্য্যতঃ চীনকে নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিল।

এর পর থেকেই প্রকৃত পক্ষে আরম্ভ হল চীনের মুক্তি আন্দোলন। ১৮৯৪ থেকে ১৯০৪ সাল এই দশ বছরের মধ্যে একটার পর একটা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ হয়েছে আর চৈনিক জনসাধারণের গলায় সাম্রাজ্যবাদী শোষণের ফাঁস একটু একটু করে শক্ত হয়ে বসেছে; কিন্তু বাঁধন যতই শক্ত হয়েছে, বাধন ছেঁড়ার আকাঙ্খা ততই প্রবল হয়েছে জনমনে। চীনজাপান যুদ্ধে পরাজয় ও সাম্রাজ্যবাদী শোষণের কারণ মাঞ্চু রাজত্বের দুর্বলতা; সামন্ততান্ত্রিক ছিন্ন ভিন্ন চীন, একথা বুঝতে ভুল করল না জনসাধারণ। এই সামন্ততন্ত্রের অবসান ঘটাবার উদ্দেশ্য নিয়ে বিদেশের চীনা ছাত্র, ব্যবসায়ী প্রভৃতিদের নিয়ে গঠিত হল "সিঙ চুঙ হুই" ডাঃ সান্ইয়াৎসেনের নেতৃত্বে। সমানে চলতে লাগল বিপ্লবী প্রচার, বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা বুঝে দলে দলে চীনা জন-সাধারণ সিঙ চুঙ হুই এর সভ্য পদ নিতে থাকে। ১৮৯৫ সালে ক্যাণ্টনে, ১৯০০ সালে হুনান প্রভৃতি স্থানে সশস্ত্র বিপ্লব ঘটতে থাকে কিন্তু মাঞ্চুরাজ অক্ষুন্নই থেকে যায়, বিপ্লব ব্যর্থ হয়। ইতিমধ্যে চীনের নিজের মাটিতে বহু বিপ্লবী সংগঠনের জন্ম হয়; তাদের "সিঙ চুঙ হুই" এর সাথে একত্রিত করে ১৯০৫ সালে স্থাপিত হল "টুঙ মিঙ হুই"। এর উদ্দেশ্য ছিল সামন্ত-তন্ত্রের উচ্ছেদ করে গণতান্ত্রিক চীনের প্রতিষ্ঠা। এই "টুঙ মিঙ হুই" আর "উচাঙ" এর সৈন্যদের সাহায্যে ১৯১১ সালে চীনে সফল বিপ্লব সংঘটিত হল। মাঞ্চু রাজত্বের অবসান ঘটল, চীনা রিপাবলিক জন্ম নিল। এই সময় "টুঙ মিঙ" হুই এর নাম বদলে হল "কুয়োমিনটাঙ।"

ইউরোপ ও আমেরিকার দেশগুলি চীনকে ভালভাবে শোষণ করার মতলবে নিজেদের স্বার্থেই চীনে রেলওয়ে, কল কারখানা, ডক প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা করতে বাধ্য হয়। ফলে চীনা সর্ব্বহারা শ্রেণীর জন্ম হয় এবং ধীরে ধীরে শ্রমিক দল গঠনের ভিত্তিও রচিত হতে থাকে। ১৯১৭ সালের রাশিয়ার সফল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সারা বিশ্বের সর্ব্বহারা শ্রেণীর মনে এক অদ্ভুত চেতনা এনে দেয়, তারা নোতুন আলো, মানুষের মত বাঁচবার আশা সফল হবার ইঙ্গিত এর মধ্যে দেখতে পায়। দেশে দেশে সাম্যবাদী

প্রীতিশ চন্দ

দল গড়ে উঠতে থাকে। চীনেও ১৯২০ সালে "চাউশিনটিয়েতে" পিকিং-হ্যাঙ্কাউ রেল ধর্ম্মঘটের সময় চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টির পত্তন হয়। বিদেশে চীনা ছাত্ররাও নিজেদের দেশে কম্যু-নিষ্টপার্টি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করতে থাকে। অবশেষে ১৯২১ সালের মে মাসে চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রথম সভা ডাকা হয়—এই কম্যুনিষ্ট পার্টির নাম "কুঙ-চানটাঙ"।

কুয়োমিন টাঙ এর লক্ষ্য ছিল সামন্ততান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদী শোষণকে চীন থেকে দূর করে সেখানে বুর্জোয়া গনতন্ত্র কায়েম করা আর কম্যুনিষ্ট পার্টির উদ্দেশ্য ছিল সাম্রাজ্য-বাদ ও সামন্ততন্ত্র উচ্ছেদ করে সমাজ-তন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। সুতরাং সামন্ততন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে উভয়ের ঐক্য-বদ্ধ হতে কোন বাধা রইল না এবং ১৯২৫ সাল থেকে ১৯২৭ সাল পর্য্যন্ত চীনা জনসাধারণ এই উদ্দেশ্য যে প্রচণ্ড সংগ্রাম চালিয়েছিল তা ইতিহাসে "তা কেহামিঙ" বলে বিখ্যাত হয়ে রয়েছে। গণশক্তির এই বিরাট অগ্রগতিকে চীনের ধনিক শ্রেণী সুনজরে দেখতে পারেনি, তারা এর মধ্যে তাদের মৃত্যু দেখতে পেল। তাই ভীষণ চেষ্টা চলতে লাগল কুয়োমিনটাঙ কুঙচানটাঙ ঐক্য ভাঙবার। বিশেষ করে কুয়োমিনটাঙের দক্ষিণপন্থী নেতৃত্ব বিরাট কায়েমি স্বার্থের অধিকারী; ১৯১ [illegible] বিপ্লবে তাদের লক্ষ্য প্রায় পৌঁছে গেছে তাই চিয়াং কাইশেককে পুরোভাগে রেখে তারা বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ত-তন্ত্রের বিরুদ্ধ সংগ্রাম ত্যাগ করে কম্যুনিষ্ট দলনে মেতে উঠল। কিন্তু চীনা জনসাধারণের হয়ে যারা লড়ছিল সেই কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রভাব প্রতিপত্তি দিন দিন বেড়ে যেতে দেখে তারা আর স্থির থাকতে পারলনা; ১৯২৭ সালের জুলাই মাসে কুয়োমিনটাঙ থেকে কম্যুনিষ্টদের বের করে দেওয়া হল এবং এর পর থেকে আজ পর্য্যন্ত শুধু চীন জাপান যুদ্ধের মধ্যে কয়েকটা বছর বাদে, চলছে চিয়াংকাইশেকের কম্যুনিষ্ট দলনের চেষ্টা আর জনতার প্রতিরোধ যুদ্ধ এবং দৃঢ় অগ্রগতি।

সাম্রাজ্যবাদের পদলেহী দেশ-দ্রোহী চিয়াং এর নৃশংস বর্ব্বর অত্যাচার

সাম্যবাদের বীজ চীন থেকে উপড়ে ফেলতে চিয়াং কাইশেক

উচ্ছেদের পথে—চীনের মুক্তিকামী জনগণ

পাঁচ পাঁচ বার অভিযান চালিয়েছেন মহাচীনের জনসাধারণের বিরুদ্ধে। ১৯৩০ সালের শেষের দিকে আরম্ভ হল প্রথম অভিযান ১লক্ষ সৈন্য নিয়ে 'লিতি পিঙ' এর অধিনায়কত্বে। পাঁচ দিক থেকে লাল চীনকে আক্রমণ চলল নির্মমভাবে, লাল চীন ৪০ হাজার সৈন্য নিয়ে বাধা দিল। অবশেষে তাদের অভূতপূর্ব বীরত্বে হটে আসতে হল কুয়োমিনটাঙী সৈন্য-বাহিনীর সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়ে। এই পরাজয় ক্ষিপ্ত করে তুলল চিয়াংকে। ১৯৩১ সালের মে মাসে আরম্ভ হল দ্বিতীয় অভিযান ২ লক্ষের বেশী সৈন্য নিয়ে—সাত দিক থেকে ঘিরে ফেলা হল লাল চীনকে। এবারও চীনা রেড আর্মির বীরত্ব ও দৃঢ়তায় পরাজিত হল চিয়াং বাহিনী। সেই বছরের জুলাই মাসে ৩লক্ষ সৈন্য ও কুয়োমিনটাঙের শ্রেষ্ঠ সেনাপতিদের নিয়ে চিয়াং নিজেই যুদ্ধ পরিচালনা করতে এলেন। তিন মাসের মধ্যে পরাজয়ের গ্লানি বহন করে হঠে আসতে হল চিয়াংকে। ইতিমধ্যে জাপান মাঞ্চুরিয়া আক্রমন করে বসেছে। কম্যুনিষ্টরা দেশের জনসাধারণকে ফ্যাসি-বাদী জাপানের বিরুদ্ধে দেশের সম্মান বাঁচাবার জন্য আহ্বান জানান এবং জাপ বিরোধী প্রতিরোধ সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হতে লাগল কিন্তু দেশের শত্রু জাপানী সরকারের সঙ্গে গোপন চুক্তি করে মাঞ্চুরিয়া ও উত্তর চীনকে জাপানীর হাতে ছেড়ে দেন চিয়াংকাইশেক শোষিত শ্রেণীর এই মুক্তি আন্দোলন ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে। কম্যুনিষ্টরা যখন জাপানকে রুখতে ব্যস্ত তখন চিয়াং এর চতুর্থ অভিযান চলল ১৯৩৩ সালের এপ্রিল মাসে। কিয়াংশি প্রদেশে চূড়ান্ত পরাজয় ঘটল চিয়াংয়ী বাহিনীর। তার পর এলেন নাৎসী সেনানায়ক ভনসেক্ট পঞ্চম অভিযানের সমস্ত দায়িত্ব নিয়ে। জার্মাণী থেকে নাম করা সেনা নায়করা এলেন, তাঁদের তত্বাবধানে গঠিত হতে লাগল কুয়োমিনটাঙ সৈন্য-বাহিনী, গ্রেটবৃটেন দিল ৫০ লক্ষ পাউণ্ড ধার, চীন আক্রমনকারী জাপান দিল অস্ত্রশস্ত্র, আমেরিকা গম ও তুলার জন্য ৫ কোটী এবং বিমানপোতের জন্য ৪ কোটী ডলার ধার দিল, অমেরিকাও ক্যানাডা থেকে এল তিন শত বিমান-চালক। বিনিময়ে যে আফিংএর প্রবেশ বন্ধ করার জন্যে চীনের জনসাধারণ দুটি যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছে চিয়াং সেই আফিং বিক্রিকেই আইন সম্মত করে দিলেন। এর ফলে প্রতি বছর তাঁর হাতে ২০ কোটী ডলার আসতে লাগল এই ভাবে সজ্জিত হয়ে ৯ লক্ষ সৈন্য নিয়ে সুরু হল চিয়াংএর পঞ্চম অভিযান। এক বছর ধরে চলল এই অভিযান। প্রথম প্রথম হারলেও শেষ পর্য্যন্ত জয়লাভ করল চীনা রেড আর্মি। এ অভিযানের শেষ আজও হয় নি তবে আজ আর চিয়াংয়ের হাতে আক্রমনের উপায় নেই। আক্রমন চালাচ্ছে জনগণের মুক্তি ফৌজ আর আত্মরক্ষা করছে চিয়াংকাই-শেক। আমেরিকার কোটী কোটী টাকার ঋণ, অস্ত্রশস্ত্র, বিমান, আমে-রিকান সামরিক মিশানের শিক্ষা কিছুতেই রোধ করতে পারছেনা কুয়ো-মিনটাঙের পরাজয়।

সাম্রাজ্যবাদী শক্তি বিনা স্বার্থে এক কপর্দকও সাহায্য করে না। চীনে তাদের এই সাহায্যের পেছনে উদ্দেশ্যও স্পষ্ট। মহাচীনকে তারা আধাসামন্ততান্ত্রিক, আধা ঔপনিবেশিক অবস্থায় রেখে দেশীয় ধনিক শ্রেণীর সাহায্য ও সহযোগিতায় জনসাধারণকে লুণ্ঠণ করতে চায়। যারা সাম্রাজ্যবাদীকে এতে সাহায্য করবে তারাই পাবে তাদের সাহায্য আর যারা এর বিরো-ধিতার জন্য এগিয়ে আসবে তাদের বিরুদ্ধে সাম্য, মৈত্র, স্বাধীনতা, গণতন্ত্র রক্ষার অজুহাতে চলবে ফ্যাসিবাদী দলন। চিয়াংকাইশেক ইঙ্গ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে চীনের জনসাধারণকে শোষণ করার পূর্ণ সুযোগ দিয়েছেন, চীনের মাটীতে—হংকং, তাইওয়ান, হাই-নান, কোয়াংটুঙ এবং সমগ্র দক্ষিণ চীনকে তাদের পায়ে বিলিয়ে দিয়েছেন। ইয়াংসী নদীর ওপর মার্কিনের সত্ব স্বীকার করে নিয়েছেন, আগামী তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধে ইঙ্গ মার্কিন নেতৃত্বে পরিচালিত সাম্রাজ্যবাদী ফ্যাসীবাদী শিবিরের বিরুদ্ধ গণতন্ত্রী সমাজতন্ত্রী শক্তিগুলিকে চীনের বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করার কাজে অনেক দিন থেকে লেগে আছেন। এর পরও সাম্রাজ্যবাদীর সাহায্য না পাবার কোন কারণ নেই।

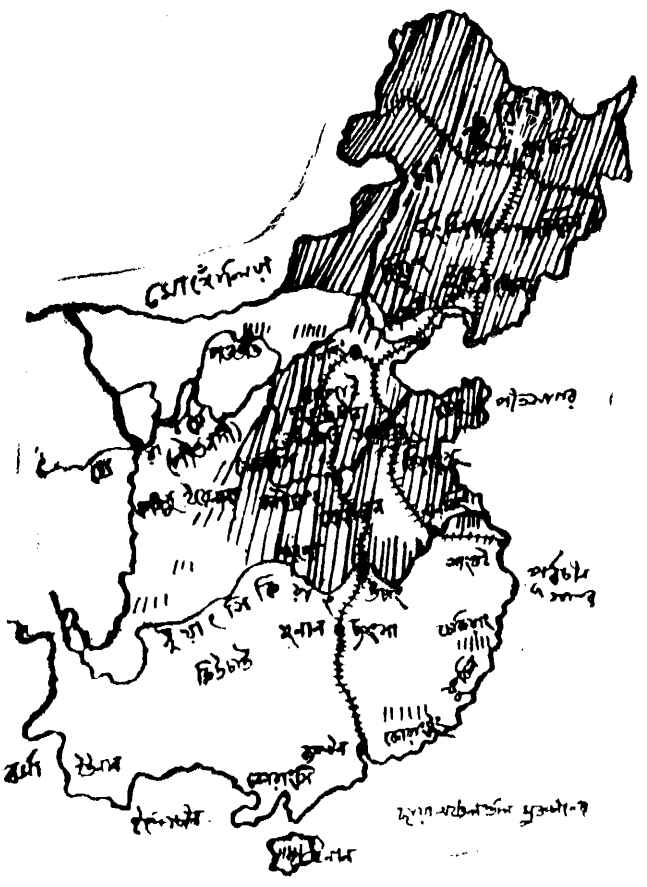

চীনের বিপ্লবী জনগণের ত্যাগের তুলনা মেলে না। এত বিভৎস অত্যাচার অন্য কোন দেশের লোক সহ্য করেছে কিনা সন্দেহ। গ্রামের পর গ্রাম চিয়াংকাইশেকের আদেশে আগুণ ধরিয়ে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়েছে, হাজার হাজার নারীর ওপর পাশবিক অত্যাচার করা হয়েছে, অসংখ্য শিশু বালক, পুরুষ নারীকে গুলি করে, বেয়নেটের খোঁচায় মেরে ফেলা হয়েছে। ১৯৩৩ সালের জুন জুলাই; চিয়াং এর সৈন্য "ৎসুউন চাই" সহরটি কয়েক ঘণ্টার জন্য দখল করে। এই কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তারা সমস্ত সহরটিকে শ্মশানে পরিণত করে, কয়েকজন বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা ব্যতীত সকলকে হত্যা করে, তরুণীদের ওপর পাশবিক অত্যাচার করে। সময়ের সল্পতার জন্য তাদের সম্পূর্ণরূপে নগ্ন করার সুযোগ পর্য্যন্ত হয়নি, অর্দ্ধ নগ্ন অবস্থায় তাদের ধর্ষণ করা হয়। শেষে তাদের গুলি করে মেরে ফেলা হয়। এ রকম দৃষ্টান্ত এক আধটা নয়, হাজারে হাজারে লাখে লাখে আছে; যে গ্রামে চিয়াংএর সৈন্যরা প্রবেশ করেছে সেই গ্রামের ওপরই এ অত্যাচার হয়েছে। অপরাধ এদের—যে মুক্তি সেনা জমিদারের কাছ থেকে জমি কেড়ে নিয়ে তাদের মধ্যে জমি বিলি করে দিয়ে না খেতে পেয়ে মরার থেকে উদ্ধার করেছে তাদের সাহায্য করা। চিয়াং কাইশেকের আদেশে এই সব অত্যাচার সংঘটিত হয়েছে, এখনও হচ্ছে তবুও নাকি চিয়াং সমস্ত কলুষতার উর্দ্ধে; চীনের শ্রেষ্ঠ মানুষ। ভারতবর্ষের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিতজীর তিনি শ্রেষ্ঠ বন্ধু; কুয়োমিটাঙ চীন তাই এত অত্যা-চারের পরও আসল গণরাষ্ট্র আর মুক্তচীন ভারতবর্ষের রাষ্ট্রের কাছে স্বীকৃতি পায় না, তার বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা হয়।

মুক্তি যুদ্ধের বর্ত্তমান অবস্থা

আজ আর চীনা মুক্তি ফৌজের অগ্রগতি, তাদের শ্রেষ্ঠত্বকে অস্বীকার করার কোন উপায়ই নেই। প্রতিটি রণাঙ্গনে দৃঢ় ভাবে এগিয়ে চলেছে মুক্তি ফৌজ, গ্রামের পর গ্রাম তাদের অধিকারে আসছে। গত দু বছরের মধ্যে মুক্তি ফৌজ দক্ষিণ রণাঙ্গনে পীত নদী ও লুচাই রেলওয়ে অতিক্রম করে মধ্য চীনের এক বিরাট অঞ্চলকে মুক্ত করে—এখানকার জন-সংখ্যা প্রায় ৩ কোটী। পূর্ব রনাঙ্গণে শানটুঙ মুক্ত অঞ্চলকে শত্রু বিমুক্ত করে, সিনান সিংটাঙ ও সিনান সুচাওয়ের মধ্যবর্ত্তি রেলপথকে দখল করে হোপেই-শানটুঙ-হোনান মুক্ত অঞ্চলের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে। পশ্চিম রণাঙ্গনে ইয়েনান পীত ড্রাগন পার্ব্বত্য অঞ্চলকে মুক্ত করে। মাঞ্চুরিয়ার রনাঙ্গনে প্রায় সমগ্র মাঞ্চুরিয়াই মুক্তি ফৌজের দখলে এসেছে।

ফলে আজ মুক্ত এলাকার মোট পরিমান মহাচীনের একচতুর্থাংশ, জন-সংখ্যা ১৬ কোটী ৮০ লক্ষ মহাচীনের জনসংখ্যার শতকরা ৩৭ভাগ, ৫৮৬টি সহর অর্থাৎ মহাচীনের, মোট সহরের শতকরা ২৮ ভাগ তার অধিকারে। এক দ্বিতীয় বছরের যুদ্ধেই ১৫লক্ষ ২০হাজার চিয়াংয়ী সৈন্যের ধ্বংস করেছে। এই বিপর্য্যয় কুয়োমিনটাঙের

(১১শ পৃঃ দেখুন)

ছাত্র আন্দোলনের গতি ও প্রকৃতি

[সপ্তম পৃঃ পর]

আমাদের জাতীয় নেতারা স্বপ্ন করেছেন, সাম্রাজ্যবাদীর স্কুলে শিক্ষা তাঁদের বিফল হয় নি দেখা গেছে। শুধু কি তাই আজও সাম্রাজ্যবাদীর সঙ্গে সহযোগিতা চলেছে সর্ববিষয়ে, অর্থ-নৈতিক, সামরিক বিষয়ে। পুঁজিবাদী ভারতীয় রাষ্ট্রের কাছে আমেরিকা হল আদর্শ; সেই আদর্শে পৌঁছুবার পথে এটলি সাহেব উপদেষ্টা আর ট্রুম্যান পৃষ্ঠরক্ষক। ভারতবর্ষের ৯০ জন, যারা তা চায় না তারা আজ তাই নেতাদের মতে দেশদ্রোহী।

—কথায় কাজে অমিল

অন্যান্য প্রগতিশীল আন্দোলনের পরিপূরক হিসেবে ছাত্রদের মূল দাবী ছিল—দেশের শিক্ষা পদ্ধতির পরিবর্ত্তন করতে হবে ও স্বাধীন রাষ্ট্রে অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে হবে। ছাত্রসমাজ এবং জনসাধারণের এই একান্ত ন্যায়সঙ্গত দাবীর যৌক্তিকতা স্বীকার করে নিতে হয়েছিল নেতাদের। ন্যাশানাল প্ল্যানিং কমিটির শিক্ষা সাবকমিটির রিপোর্টে তা লিপিবদ্ধ আছে এই প্ল্যানিং কমিটির উদ্বোধক ছিলেন তদানীন্তন কংগ্রেস সভাপতি সুভাষচন্দ্র, কমিটির সভাপতি ছিলেন গণিতজ্ঞ। সুতরাং আশা করা অন্যায় নয় যে, নেতারা সেই মত কাজ করবেন। কিন্তু সে আশা অপূরিত থেকে গেছে—সরকারী শিক্ষা তদন্ত কমিটি রায় দিয়েছেন যে, আগামী ১৫ বৎসরের মধ্যে অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হবার সম্ভাবনা নেই আর শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তনের চিন্তা করাই বাতুলতা। **ইংরাজ সরকার তাকে ভারতবর্ষকে শোষণ বিষয়ে সাহায্য করার জন্য তার অধীনে বিশ্বস্ত ও অনুগত এক দল কেরাণী ও কর্ম্মচারী যে শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে গড়ে তুলতে চেয়েছিল এবং তুলেছিল ও সে ব্যবস্থার এতটুকুও পরিবর্ত্তন হয় নি। খুব শাঘ্র হবার কোন লক্ষণও দেখা যাচ্ছে না। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, এখন প্রকৃত মানুষ গড়ার ক্ষেত্র নয়, কেরাণী উৎপাদনের যন্ত্র। পুঁজিবাদী ভারতীয় রাষ্ট্রের তার অধিনস্থ আমলা তন্ত্র চাই বিশ্ববিদ্যালয় সেইগুলি জোগাবে।** নেতাদের শিল্প, বাণিজ্য ভূমিবিষয়ক অন্যান্য অঙ্গীকারগুলি আজও যেমন ফলপ্রসূ হয়নি শিক্ষা-বিষয়েও সেই এক দশা। তবে একথা বলে ভুল হবে যে নেতারা কোন সংস্কারই করবেন না। ভারতবর্ষের ঔপনিবেশিক পুঁজিপতিরা ক্ষমতা হস্তগত করেছে; পূর্ণবুর্জোয়া গণতান্ত্রিক রূপ দেওয়া তাদের পক্ষে অসম্ভব সাম্রাজ্যবাদীর নিকট অধীনতা এবং সামন্ততন্ত্রের কাছে বাধ্যবাধকতার দরুণ, এ কথা স্বীকার করে নিলেও ভুললে চলবে না যে, নিজের স্বার্থের খাতিরেই ধনিক শ্রেণীর কিছু কিছু সংস্কার করতে হবে। তবে সে সব সংস্কার যে জনস্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে হবে না বা জনসাধারণের দাবী যে তাতে পরিপূরিত হতে পারে না এটাও ঠিক।

শিক্ষাসংস্কারের সঙ্গে শিক্ষকের নিবীড় সম্পর্ক আছে। তাই শিক্ষকদের নীচের দাবীগুলিও শিক্ষা সাবকমিটি মেনে নিয়েছিল। ১। জীবনধারণের উপযুক্ত মাহিনা ২। চাকুরীর স্থায়িত্ব ৩। অতিরিক্ত বিদ্যার্জন ও দেশভ্রমণের দ্বারা উন্নত হবার সুযোগ দান ৪। কার্যশেষে অবসর কালে পেনশন অথবা প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের ব্যবস্থা ৫। ব্যক্তিগত মত প্রকাশ ও সমিতি গঠনের স্বাধীনতা। এরজায়গায় দেখি ১৮ টাকা মাসিক বেতনের প্রাথমিক শিক্ষক অর্থাভাবে অন্নাভাবে, আত্মহত্যা করে নিষ্কৃতি খোঁজে, পরিচালক কমিটির খেয়ালখুশী মত অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য স্কুল কলেজ বন্ধ হয়ে যায়, শিক্ষক আর অধ্যাপকদের বিনাকারণে বরখাস্ত করা হয়, ব্যক্তিগত মত প্রকাশ করার জন্য বিদ্যালয়ের আর্থিক সাহায্য বন্ধ হয়ে যায়।

বাঁচার উপায়—পুঁজিবাদীরাষ্ট্রের উচ্ছেদ

এ প্রাণান্তকর অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে হলে চাই বর্ত্তমান পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের উচ্ছেদ। যতদিন পুঁজিবাদী রাষ্ট্র টিকে থাকবে ততদিন জনস্বার্থ সংরক্ষিত হতে পারে না। অথচ জনস্বার্থ স্বীকৃত না হলে শিক্ষাসংক্রান্ত সমস্যাও মিটতে পারে না। তাই জাতীয় সরকারের দোহাই পেড়ে কিংবা গঠনমূলকভাবে যারা ছাত্রদের সরকারের সহিত সহযোগিতার কথা বলছে তারা আসল প্রশ্ন থেকে ছাত্রদের সরিয়ে নিয়ে যেতে চায়। তারা হয় ধনিক শ্রেণীভুক্ত শাসক গোষ্ঠি কিংবা তাদের পোষ্য দালাল শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। ধনিক শ্রেণীর সহিত সহযোগিতার অর্থ তার অবস্থাকে আরও সুদৃঢ় করে নিতে সাহায্য করা, নগ্ন-ফ্যাসিবাদ প্রতিষ্ঠায় অংশ গ্রহণ করা। এই অবস্থায় যখন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে জাতিগতভাবে একত্রিত সংগ্রামের কোন প্রত্যক্ষ উপায় নেই এবং দেশীয় পুঁজিপতি শ্রেণীই রাষ্ট্রক্ষমতা করায়ত্ব করেছে তখন মূলতঃ শ্রেণী-সংগ্রামের দিন এসে গিয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। বর্ত্তমানের একমাত্র ঐতিহাসিক দায়িত্বও তাই দেশের সমগ্র গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক শক্তিকে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ভিত্তিতে একত্রিত করা।

ছাত্রদের কর্ত্তব্য

ছাত্র সমাজ কোন বিশেষ শ্রেণীভুক্ত নয়; সুতরাং নিজস্ব কোন শ্রেণীভূমিকাও তাদের থাকতে পারে না। আগামী ভারতীয় বিপ্লবে তাই হয় তাকে ধনিক শ্রেণীর শক্তি হিসেবে নয় সর্ব্বহারা শ্রেণীর মিত্র হিসেবে চলতে হবে। অন্য কোন মধ্যপথ এর মধ্যে নেই। তবে অন্যান্য দেশে এবং আমাদের দেশেও দেখা গিয়েছে যে, ছাত্রশক্তি প্রগতিবাদী। এই কারণে তারা বৃহত্তর গণতান্ত্রিক শক্তির মধ্যে অন্তর্গত। সেই হিসেবে তাকে একদিকে একত্রিত হতে হবে নিজেদের মধ্যে অন্যদিকে অন্যান্য গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির সাথে। কিন্তু এর পরিবর্ত্তে যা লক্ষ্য করা যাচ্ছে তা প্রকৃতই পরিতাপের বিষয়। বিভিন্ন শ্রেণীস্বার্থের ধারক হিসেবে ভারতবর্ষে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলি ছাত্র আন্দোলনকে পরিচালিত করে আসছে। ছাত্র প্রতিষ্ঠানের জন্মের সঙ্গে দেশপ্রিয় যতীন্দ্র মোহন ও সুভাষ চন্দ্রকে কেন্দ্র করে যে বিভেদ বেধেছিল ছাত্রদের মধ্যে তা কমার বদলে বেড়েই চলেছে। দিন যত এগুচ্ছে প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও তত বেড়ে চলেছে—ছাত্রদের মধ্যে ঐক্যফ্রন্ট ততই দূরে সরে যাচ্ছে। তবুও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের মধ্যে বিভেদ থাকা সত্ত্বেও তারা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে একত্রিত হতে পেরেছিল কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শেষ হওয়ার পর থেকে এবং মূলতঃ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সামাজিক অবস্থা আসায় নোতুন করে বিভেদ দেখা দিয়েছে বৃহত্তর ভাবে। একদল ছাত্র দক্ষিণপন্থী নেতাদের দলে যোগ দিয়ে জাতীয় স্বার্থের নামে দেশীয় ধনিক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করছেন। দ্বিতীয় দল বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দলের ছাত্র কংগ্রেস মুখে ছাত্র ঐক্যের কথা বললেও আজ পর্য্যন্ত যতগুলি ছাত্র আন্দোলন হয়েছে তাতে হয় কংগ্রেসী ছাত্র প্রতিষ্ঠান না হয় সমাজতন্ত্রী দলের সঙ্গে মিলে বিভেদ সৃষ্টি করেছেন। পশ্চিম বঙ্গ নিরাপত্তা বিলের বিরুদ্ধে মিলিত ছাত্রদের আন্দোলন থেকে শিক্ষক ধর্ম্মঘটের দিন পর্য্যন্ত এঁরা একটি ক্ষেত্রেও ঐক্যবদ্ধ হবার চেষ্টা করেননি বরং যখনই ঐক্যবদ্ধতার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে তখনই তাকে কৌশলে বানচাল করে দিয়েছেন নগণ্য বিষয়কে কেন্দ্র করে। তৃতীয় দল কম্যুনিষ্ট পার্টি পরিচালিত ছাত্র-ফেডারেশন। মুখে এঁরা গণতান্ত্রিক ঐক্যফ্রন্টের কথা এখনও বলেন, ঐক্যবদ্ধ ছাত্র আন্দোলনের যুক্তি স্বীকার করেন কিন্তু ব্যবহারে মনে হয় এরা আসলে ঐক্যফ্রন্টেই বিশ্বাস করেন না। এঁরা ভাবেন তাঁরাই একমাত্র সংগ্রাম করছেন এবং তাঁহাদের প্রতিষ্ঠানে যোগ দিয়ে ঐক্যফ্রন্ট গড়ে তোলা উচিত। **এই সব কথা থেকে মনে হয় এঁরা গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট বলতে নিজেদের দলীয় ফ্রন্ট বোঝেন।** বুঝতে তাঁরা অবশ্য পারেন কিন্তু আসলে জিনীষটা তা নয়। সংগ্রাম অন্য প্রতিষ্ঠানও করে এবং চিন্তাগত পার্থক্য আছে বলেই ভিন্ন প্রতিষ্ঠান গুলি আছে। একথা না বুঝে যদি প্রত্যেককে তাঁদের সঙ্গে যোগ দিতে বলা হয় তাহলে বোঝা যায় যে, তাঁরা দলীয় মোহের বশেই বাস্তব রাজনৈতিক অবস্থার বিশ্লেষণ করতে পারছেন না। এই দলগোড়ামীই অতীতে বহু ঐক্য প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়েছে এখনও দিচ্ছে। **তাই সমগ্র ছাত্র সমাজের কাছে অনুরোধ বিভিন্ন পুঁজিবাদ বিরোধী গণতন্ত্রী সমাজতন্ত্রী ছাত্রশক্তিকে যাতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর গ্রহণ যোগ্য কর্ম্মসূচার ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ করা যায় তার জন্য যেন তাঁরা এগিয়ে আসেন। বিভিন্ন ছাত্র প্রতিষ্ঠান যখন তাদের কর্ত্তব্য সম্পাদনে সচেষ্ট নয় তখন তাঁদেরই তুলে নিতে হবে এই ছাত্রদের ঐক্যবদ্ধ করার ঐতিহাসিক দাবী।**

● শ্রমিক, কৃষক, নিম্নমধ্যবিত্তের সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে ছাত্র আন্দোলন

● পুঁজিবাদ বিরোধী ছাত্র ঐক্যফ্রণ্টই ছাত্রসমাজের দাবী মেটাতে পারে

যতদিন পুঁজিবাদী রাষ্ট্র কায়েম থাকবে ততদিন ছাত্রদের দাবী স্বীকৃত হবে না

জনস্বার্থবিরোধী "জাতীয়তার" মোহ ছাত্রদের কাটিয়ে উঠতেই হবে

সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদ ও সামন্ততন্ত্র উচ্ছেদের পথে—চীনের মুক্তিকামী জনগণ

(৯ম পৃষ্ঠার পর)

সৈন্য বাহিনীতে এক বিক্ষোভ সৃষ্টি করেছে যার ফলে বহু সৈন্যই মুক্তি ফৌজে যোগ দিয়েছে এবং দিচ্ছে। বিরাট এই ক্ষয় ক্ষতির কথা স্বীকার পর্যান্ত করতে বাধ্য হয়েছেন কুয়োমিনটাঙের দেশরক্ষাসচিব জেনারেল হো ইং চিন। তিনি উভয় দলের লাভ লোকসানের যে খবরটি দিয়েছেন তা নীচের তালিকায় দেওয়া হল।

জাপ পরাজয়ের ঠিক পরেঃ—

	সৈন্য	রাইফেল	কামান
কুয়োমিনটাঙ—	৩৭লক্ষ	১৬লক্ষ	৬হাজার
কম্যুনিষ্ট—	৩লক্ষ২০হাজার	১লক্ষ৬০হাজার	৬শত

এখনঃ—

	সৈন্য	রাইফেল	কামান
কুয়োমিনটাঙ—	২১ লক্ষ ৮০ হাজার	৯ লক্ষ ৮০ হাজার	২১ হাজার
কম্যুনিষ্ট—	২৬ লক্ষ ৯লক্ষ৭০হাজার	২২হাজার	৮শত

(চায়না ডাইজেষ্ট ১৩ই জুলাই, '৪৮)

এই বিরাট সামরিক জয়লাভ কম্যুনিষ্ট দল কর্ত্তৃক উপযুক্ত পথ গ্রহণের প্রমান।

দুর্ভিক্ষ ও অত্যাচারে জর্জ্জরিত কুয়োমিনটাঙ চীন

সামন্ততান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদী শোষনের ফলে কুয়োমিনটাঙ চীনের জনসাধারণ দারিদ্রের শেষ প্রান্তে পৌঁছেছে, মুদ্রাস্ফীতির দরুণ দিনের পর দিন জনসাধারণের জীবন যাত্রার খরচ বেড়েই চলেছে অথচ তাদের রোজগার বাড়েনি বরং কমেছে। ১৯৩৭ সালে যেখানে ৫০ কিলোগ্রাম চালের দাম ছিল ৮ চীনা ডলার আজ তা হয়েছে ৪৫ লক্ষ ডলার। লক্ষ লক্ষ ডলার দিয়েও এক জোড়া জুতো মেলে না। এসব কথা চিয়াং কাইশেকের প্রভু ইঙ্গমার্কিনদের দেশের সংবাদপত্র গুলি পর্য্যন্ত স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছে, দুর্ভিক্ষের তাড়নায় নিরুপায় মাবাপ ছেলে মেয়েকে রাস্তায় ত্যাগ করে চলে গেছে, সেই সব অনাথ শিশু বালক বালিকার মিছিল কুয়োমিনটাঙ চীনের যে কোন সহরের দৃশ্য। চোরা কারবার ও সরকারী কর্ম্মচারীদের দুর্নীতির ফলে শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্তরা মৃত্যুপথযাত্রী তবুও তাদের বিক্ষোভ জানাবার উপায় নেই। জানাতে গেলে নির্ম্মমভাবে গুলি করে শেষ করে দেওয়া হয়, মার্কিন সৈন্যবাহিনী কুয়োমিনটাঙ সরকারকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে, তাদেরই হাতের গুলিতে চীনের মাটী চীনেরই জনসাধারণের রক্তে লাল হয়ে যায়। চিয়াং এর আদেশে ট্রেডইউনিয়ন গুলি বেআইনী প্রতিষ্ঠান বলে ঘোষিত হয়েছে, এক হাঙ্কাউ সহরে ৪০০ জন শ্রমিককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, সাংহাইতে ৩০০ জনকে গ্রেপ্তার, দুজন নারীশ্রমিককে গুলি করে হত্যা, ১জনকে ৩তলা থেকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে হত্যা, ৬০ জনকে আহত করা হয়েছে। এক কথায় কুয়োমিনটাঙ চীন হল দুর্ভিক্ষ, মহামারী, বেকার সমস্যা ও ফ্যাসিবাদী স্বৈরতন্ত্রের জাগ্রত প্রতিমুর্ত্তি, অশিক্ষা, দৈন্য, অপমৃত্যু ও হত্যা এর সঙ্গী।

মুক্তচীনে শ্রমিককৃষক নিম্নমধ্যবিত্তের জয়যাত্রা

আর মুক্ত চীনে শ্রমিক প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্রের দামের অনুপাতেই মজুরী পায়; কারখানায় কারখানায় ক্লাব গড়ে উঠেছে, হাজার হাজার শ্রমিক তার মধ্য দিয়ে আমোদ প্রমোদ খেলা ধুলা করতে পায় তাদের শিক্ষার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। কুয়োমিনটাঙ চীনে যেখানে শতকরা ২০ জনের মত শ্রমিক লিখতে পড়তে জানত আজ মুক্তচীনে তার সংখ্যা ৭৫ জনের বেশী। যে কৃষক শ্রেণী জমির অভাবে ধ্বংস হতে বসেছিল তাদের প্রত্যেককে দেওয়া হয়েছে জমি। নারী পেয়েছে পুরুষের সমান অধিকার; প্রত্যেক শিশু প্রাথমিক স্কুল থেকে কলেজ পর্য্যন্ত বিনা ব্যয়ে শিক্ষার সুযোগ পায়। শোষিত শ্রেণী উপশ্রেণী গুলি নিজেদের নির্বাচিত প্রতিনিধি দিয়ে দেশ শাসন করে। তথাকথিত গণতন্ত্রী দেশগুলিতে স্বাধীন নির্বাচনের নামে যেমন পুঁজিবাদী স্বৈরতন্ত্র চাপিয়ে দেওয়া হয় জনসাধারণের উপর, মুক্তচীনে তা হবার সম্ভাবনাই নেই—শোষিত শ্রেণী উপশ্রেণী গুলির সংগ্রামী ঐক্য এবং কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতৃত্ব সেখানে জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষার Guarantee।

নয়া গণতন্ত্র কি ?

যে উপায় অবলম্বন করে মুক্তচীনের এই সাফল্য তাকে এক কথায় 'নয়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা' বলতে পারা যায়। নয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নীতি হল নয়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা। সুতরাং পরিষ্কার করে বোঝা দরকার নয়াগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের রূপ, চরিত্র, এবং শক্তি কি? চরিত্র এবং শ্রেণী বিন্যাসের দিক দিয়ে নয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কাঠামো অন্যান্য দেশের রাষ্ট্র কাঠামো থেকে ভিন্ন হতে বাধ্য। সে পুঁজিবাদী বা সমাজতন্ত্রী কোন রাষ্ট্রই নয় যেহেতু তথাকথিত গণতন্ত্রী দেশগুলির মত সেখানে ধনিক শ্রেণীর একনায়কত্বে অথবা সোভিয়েট ইউনিয়নের মত সর্বহারার একনায়কত্বে রাষ্ট্র যন্ত্র পরিচালিত হয় না। ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে সেখানে উচ্ছেদ করা হয় না, জমিদারের জমী সেখানে বাজেয়াপ্ত করে কৃষকদের মধ্যে বিলি করে দেওয়া হয়, ছোট ছোট উৎপাদনের যন্ত্রকে সেখানে ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবে পরিগণিত করা হয় এবং তার প্রসারের ব্যবস্থাও করা হয়। এই সব ব্যবস্থা গুলিকে কোন রকমেই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সঙ্গে খাপ খাওয়ান যেতে পারে না। কিন্তু বড় বড় শিল্প, খনি, যান বাহন, ব্যাঙ্কিং প্রভৃতি ব্যবসাকে জাতীয় করণ করে রাষ্ট্রের অধিকারে আনা হয়। এই জাতীয় করণ কিংবা রাষ্ট্রীয় করণেই অবশ্য কোন রাষ্ট্রের চরিত্র বদলায় না; অনেক পুঁজিবাদী রাষ্ট্র পুঁজিবাদী স্বার্থেই অনেক সময় শিল্পগুলিকে জাতীয় করণ করে থাকে। নাজী জার্মাণী, বর্ত্তমানের গ্রেট বৃটেন তার জলন্ত প্রমান। সর্বহারা শ্রেণীর নেতৃত্বে শ্রমজীবী শ্রেণীর এক বিরাট অংশ নয়াগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সর্বাপেক্ষা প্রধান শক্তি বলেই রাষ্ট্র ধনিক শ্রেণীর হাতে শোষণের যন্ত্র না হয়ে, শোষিত শ্রেণী উপশ্রেণী গুলির শ্রেণী-স্বার্থরক্ষার অস্ত্রই হয়। এই দিক থেকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সঙ্গে এর নৈকট্য ও সম্পর্ক অনেক বেশী। নয়াগনতান্ত্রিক গভর্ণমেণ্ট ও নয়া ব্যবস্থার সমর্থনকারীদের নিয়ে গঠিত হয় শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে দেশের মধ্যেকার দুর্বল বুর্জোয়া শ্রেণীকে আরও দুর্বল করার এবং সমাজতান্ত্রিক শক্তির ক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্য নিয়ে।

এ কথা অবশ্য স্বীকার করতে হবে যে নয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের দ্বারা আনীত সংস্কারগুলি বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কার্য্য সূচীর অন্তর্গত তবুও বুর্জোয়া শ্রেণীর নেতৃত্বের স্থলে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকায় বুর্জোয়া শ্রেণী বিপ্লবকে যতদূর পর্য্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যেতে পারত শ্রমিক শ্রেণী তার চেয়ে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যায়, এবং এর মধ্য দিয়ে সমাজতন্ত্র কায়েম করে। সুতরাং নয়াগণতন্ত্র বুর্জোয়া গণতন্ত্র এবং সর্বহারার গণতন্ত্র এর কোনটাই নয়; এ এক নোতুন গণতন্ত্র। এ থেকে যদি কেউ মনে করে নয়া গণতন্ত্র হল বর্ত্তমান অবস্থায় নোতুন এক সামাজিক স্তর, তাহলে মারাত্মক ভুল হবে। নয়া গণতন্ত্র নোতুন সামাজিক স্তর নয় এবং প্রত্যেক দেশেও তা প্রযোজ্য নয়। বিশেষ আন্তর্জাতীক পরিস্থিতি ও জাতীয় অবস্থাতেই এর সঠিক প্রয়োগ হতে পারে।

আজকের বিশ্ব জোড়া একচেটে পুঁজিবাদের দিনে যেখানে ধনিক শ্রেণী সবল শ্রেণী হিসেবে জন্ম নিতে পারে নি এমন কি যার একাংশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সঙ্গে সহযোগিতার মারফত দেশের জনসাধারণকে শোষণ করে চলেছে ফলে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবে নেতৃত্ব দেবার যোগ্যতা ও ক্ষমতা নেই যে দেশের ধনিক শ্রেণীর অথচ সেই দেশের শ্রমিক শ্রেণীও এত শক্তিশালী নয় যে বিপ্লবে নেতৃত্ব দিয়ে ও তার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারে এই রকম আধা ঔপনিবেশিক ও আধা সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রেই নয়া গণতন্ত্র চালু হতে পারে; শুধু তাই নয় দেশের উৎপাদন ব্যবস্থাও মোটের ওপর খুব অনুন্নত হওয়ার জন্য সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনা গ্রহণ করাই সম্ভবপর হয় না। এই রকম অবস্থাতেই সামন্ততান্ত্রিক স্বৈরাচার ও সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে গণতন্ত্র ও পূর্ণ জাতীয় স্বাধীনতার আহ্বানে জনসাধারণকে একত্রিত করে নয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। অর্থাৎ সংক্ষেপে বললে বিশেষ আন্তর্জাতিক ও জাতীয় অবস্থায় শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক শক্তি গুলির সহযোগিতায় গঠিত রাষ্ট্রের মধ্যে দিয়ে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে সম্পূর্ণ করার কম্যুনিষ্ট পার্টির কৌশলই হল নয়াগণতন্ত্র।

চীনের কম্যুনিষ্ট দল ভুল করে নি

আমাদের দেশের অনেক তথাকথিত মার্ক্সবাদী দল নয়া গণতন্ত্রের এই বৈশিষ্ট বুঝতে ভুল করে সমানে চিৎকার করে চলেছে—চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টি ভুল পথে চলেছে, সমাজ-

(১৪শ পৃষ্ঠায় দেখুন)

নেহেরু সরকারের কুয়োমিনটাঙ চীনের সংঙ্গে সম্পর্ক ছেদ চাই।
মুক্ত চীনকে স্বীকার করে নিতে হবে সরকারীভাবে।
ভারতীয় পুঁজিবাদ বিরোধী সংগ্রামী ঐক্য ফ্রন্টই দাবী প্রতিষ্ঠা করতে পারে ভারতীয় পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের ধ্বংস করে।

কৃষক আন্দোলনের পথ নির্দ্দেশ—পুঁজিবাদ ও সামন্ত

ভারতবর্ষের শতকরা ৭৫ জনের বেশী কৃষক অথচ ভারতের কৃষক সমস্যা, তার ভূমি সমস্যার কোন সমাধানই আজও হয় নাই। দীর্ঘ ৬০ বৎসর ধরিয়া জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে ভারতীয় কৃষক সমাজ সর্বান্তকরণে যে যোগ দিয়াছিল তাহার কারণ সে ভাবিয়াছিল, বিদেশী শাসন ভার দেশের বুক হইতে অপসৃত হইলে তাহার জীবনের সমস্যাগুলির সঠিক সমাধান হইবে। জমিদারী জোতদারী প্রথার বিলোপ ঘটিয়া জমি তাহার হাতে আসিবে অথচ দেড় বৎসরের মধ্যে স্বাধীন কংগ্রেসী সরকারের তাহা করিবার সময় হইয়া উঠিল না। ভারতীয় জমিদার, মিল-মালিক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার্থে ইতিমধ্যে বহু আইন রচিত হইয়া গিয়াছে, শ্রমিককে নিষ্পিষ্ট করিবার উৎসাহের এতটুকুও অভাব আজ পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায় নাই অথচ নির্বাচন বৈতরনী পার হইবার সময় অনেক গালভরা প্রতিজ্ঞা করিয়াও আজ পর্য্যন্ত নেতাদের লক্ষ্য দিবার সময়ই হইয়া উঠিল না ভারতের দরিদ্র কৃষকের দিকে ক্ষণেকের জন্য। সুতরাং যতদিন না ভূমি ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন হইতেছে, যতদিন না জমিদারী প্রথার বিলোপ ঘটিতেছে, জমির মালিকানা চাষীর হাতে যাইতেছে ততদিন স্বাধীন ভারতের কোন পার্থক্য নাই পরাধীন ইংরাজ শাসিত ভারতবর্ষের সহিত কৃষকের কাছে।

কংগ্রেসের কৃষক দরদের নমুনা

কংগ্রেসী নেতারা নাকি বসিয়া নাই; ইতিমধ্যে বিভিন্ন প্রদেশে তাঁহারা জমিদারী প্রথার বিলোপ ঘটাইবার এবং ভূমি ব্যবস্থার সংস্কারের জন্য নাকি আইন আনিতেছেন। তবে সেই সব বিরাট বিরাট কয়েক শত পৃষ্ঠাব্যাপী পরিকল্পনাগুলি বিশ্লেষণ করিলে মোটামুটীভাবে বোঝা যায় যে (১) মোটারকমের ক্ষতিপূরণ দিয়া সরকার জমিদারীর সত্ব কিনিয়া লইবেন (২) জমিদারের খাস জমিতে হাত দেওয়া হইবে না (৩) জমিদারের পরিবর্ত্তে চাষীর সহিত সরকারের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক থাকিবে। একে একে বিচার করিয়া দেখা যাক উপরোক্ত ব্যবস্থায় কৃষকের সুবিধা হইবে কি অসুবিধা হইবে।

ক্ষতিপূরণের নামে ভারতীয় মেহনৎকারী জনসাধারণের ঘাড়ে কি বিরাট বোঝা চাপান হইতেছে তাহার প্রমাণ মিলিবে নিম্নোক্ত হিসাব হইতে :—

	ক্ষতিপূরণের মোট পরিমাণ	শতকরা ২½ হার সুদে বার্ষিক সুদের পরিমান	বাজেটের মোট খরচ	শতকরা কত ভাগ
বিহার	৮০ কোটী	২ কোটী	২০ কোটী	১০
যুক্তপ্রদেশ	১৩০ ,,	৩ ,, ২৫ লক্ষ	৫০ ,,	১৬
পশ্চিম বাংলা	৮০ ,,	২ ,,	৪০ ,,	৫

যদি বার্ষিক সুদই শোধ করিতে হয় তাহা হইলে বাজেটের কি পরিমান টাকা সুদ বাবদেই বাহির হইয়া যাইবে তাহা বুঝা যাইতেছে। ইহার উপর ক্ষতিপূরণ বাবদে জমির মূল্যের কথা তুলিলে টাকার অঙ্কটি কি বিরাট হয় তাহাতে দরিদ্র ভারতবাসীর বিস্মিত হইতে হয়। এই সমস্ত ক্ষতিপূরণ পরোক্ষভাবে জনসাধারণের নিকট হইতে আদায় করা হইবে। সুতরাং তাহাদিগকে আরও নিপীড়িত হইতে হইবে নিত্য নব করভারে।

জমিদারের খাস জমিতে হাত দেওয়া হইবে না। অথচ এই জমিদার শ্রেণীর হাতে ভারতবর্ষের মোট জমির অর্দ্ধেকের বেশী। দেশের সমগ্র চাষোপযোগী জমি যদি ন্যায্যভাবে বণ্টন করিয়াই না দেওয়া হয়, জমিদার জোতদারের হাতে দেশের জমির অধিকাংশই রাখিয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে জমিদারের প্রজাবিলি জমিগুলির সত্ব সরকার কিনিয়া লইলেও এবং কৃষকের সহিত প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ স্থাপন করিলেও প্রজাদের কোন সুবিধা হইতে পারে না, হইবেও না। জমি নূতন করিয়া কৃষকের মধ্যে বিলি না করিলে কৃষকের কিছুই লাভ হইবে না, যে তিমিরে তাহারা এতদিন ছিল সেই তিমিরেই তাহাদিগকে থাকিতে হইবে। বাংলাদেশে যদি জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ হয় কংগেসী মতে তাহা হইলে কৃষকদের হাতে কি পরিমাণ জমি থাকিবে তাহার হিসাব দেওয়া হইল।

শতকরা কতজন পরিবার	কত একর জমির মালিক	মোট জমির শতকরা কত অংশ
৩০·৪৬	•	•
৩৬·৮৩	• হইতে ২	১৬·৪৭
২১·১৭	২ ,, ৫	২৭·৩৬
৭·৭৭	৫ ,, ১০	২৩·৩১
৩·৭৪	১০ এর উর্দ্ধে	৩০·৪৯

ইহা ব্যতীত কংগ্রেসী পরিকল্পনার জমিদার শ্রেণীকে উচ্ছেদ করিবার কোন প্রচেষ্টাত নাই বরং তাহাদিগকে পুঁজিবাদী কায়দায় জিয়াইয়া রাখিয়া গ্রাম্যজীবনের নেতৃত্বে বসাইবার কৌশলী চেষ্টা আছে। সুতরাং কংগেসী ভূমিব্যবস্থার সংস্কারের মধ্য দিয়া না হইতেছে বর্ত্তমানের শ্রেণী সম্পর্কের কোন পরিবর্ত্তন, না সামন্ততন্ত্রের উচ্ছেদ বরং সামন্ততন্ত্রকে পুজিবাদী ব্যবস্থার উপযোগী করিয়া টিকাইয়া রাখার চেষ্টা হইতেছে।

ঔপনিবেশিক পুঁজির সামন্ততন্ত্র ঘেঁষারূপ

সামন্ততান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় কৃষক ভূমি-দাস। জমিদারের নিকট হইতে সে যে জমি পায় তাহাতে নিজস্ব যন্ত্রপাতি ও শ্রমের সাহায্যে যে ফসল উৎপন্ন করে তাহা হইতে নিজের বাঁচিবার মত অংশ রাখিয়া দিয়া বাকি ফসল জমিদারকে দিয়া দিতে হয়। কিন্তু ধনতান্ত্রিক অবস্থায় কৃষক দাস নয় বড় জোর সে ক্ষেতমজুর। জমি, যন্ত্রপাতি, মূলধন আর শ্রমের সাহায্যে যে ফসল সে উৎপন্ন করে তাহা বাজারে বিক্রয় করিয়া টাকার হিসাবে সে জমিদারকে জমির খাজনা দেয়। পুজিবাদী শোষণের ফলে এক দল কৃষক ক্ষেতমজুরে পরিণত হয়; ইহারা অন্যের জমিতে পরিশ্রম করিয়া জীবন ধারণ করে। ধনতান্ত্রিক সমাজ-কাঠামোয় কৃষি ব্যবস্থার ইহাই হইল বৈশিষ্ট—একদিকে গ্রাম্য ধনিকদল যাহারা জমিতে নিজেরা না খাটিয়া বা প্রজাবিলি না করিয়া ক্ষেতমজুরের দ্বারা চাষ করায় অন্য দিকে ভূমি শূন্য ক্ষেত মজুরের দল যাহারা সহরের সর্বহারা শ্রেণীর মত আপনার শ্রম বেচিয়া দিন গুজরায়।

সামন্ততান্ত্রিক কৃষি ব্যবস্থা হইতে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উপনীত হইবারও পথ একটি নয়, দুইটি। প্রথম পথটি আমেরিকার পথ দ্বিতীয়টী জার্মাণীর। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্য দিয়া ধনিক শ্রেণী ক্ষমতা লাভ করিলে সামন্ততান্ত্রিক অবস্থার সম্পূর্ণ অবসান ঘটাইতে পারে। আমেরিকায় ইহাই হইয়াছিল কিংবা সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্কগুলিকে একেবারে উচ্ছেদ না করিয়া ধীরে ধীরে তাহাদিগকে ধনতন্ত্রের সহিত মানাইয়া লওয়া হয়। শেষোক্ত পথে সামন্ততান্ত্রিক বৈশিষ্টগুলি বহুদিন পর্য্যন্ত ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে বর্ত্তমান থাকে। জার্মাণীর বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পর সামন্ততন্ত্রকে এইভাবেই বাঁচাইয়া রাখা হইয়াছিল। সুতরাং ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু হইলেই যে সম্পূর্ণরূপে ভূমিশূণ্য কৃষক সম্প্রদায় দেখা যাইবে তাহা নয়। অনেক সময় ক্ষেতমজুরও সামান্য জমি চাসবাস করিতে পারে।

ধনতান্ত্রিক দেশগুলির পক্ষে ইহা যেরূপ সত্য, উপনিবেশগুলির বেলায় ইহা তদোধিক প্রযোজ্য। ভারতবর্ষের সামন্ততন্ত্র প্রায় দুইশত বৎসরের মত ধনতন্ত্রের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে ও হইতেছে। ফলে ধনতান্ত্রিক বৈশিষ্ট কিছু কিছু তাহাকে গ্রহণ করিতে হইয়াছে নিজেকে নূতন অবস্থার সহিত খাপ খাওয়াইয়া লইবার উদ্দেশ্যে এবং সে অনেকটা ধনতন্ত্র ঘেঁষা হইয়া উঠিয়াছে। আবার ভারতীয় ঔপনিবেশিক পুঁজি সামন্ততন্ত্র ধ্বংস করিয়া স্বাভাবিকভাবে বাড়িয়া উঠিতে না পারায় বরং সামন্ততন্ত্রের জঠরের

প্রমোদ সিংহ রায়

মধ্যে জন্মলাভ করায়, ও বর্দ্ধিত হওয়ায় তাহাকে সামন্ততন্ত্রের সহিত অনেক আপোষ করিয়া লইতে হইয়াছে। এই আপোষস্পৃহা আরও বাড়িয়া গিয়াছে জনগণের বিপ্লবী প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে তাহাকে বন্ধু হিসাবে পাইবার সম্ভাবনায়। ফলে ঔপনিবেশিক পুজির মধ্যে সামন্ততান্ত্রিক বহু বৈশিষ্ট রূপ লইয়াছে। সুতরাং ভারতবর্ষের কৃষিব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা বলা যেমন ভুল, ধনতান্ত্রিক বলাও তদপেক্ষা ভুল—ইহা ঐ দুই ব্যবস্থার এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ, সমন্বয়।

ভারতীয় কৃষকের শ্রেণী বিন্যাস

এই অদ্ভুত সমন্বয় ভারতীয় কৃষক সমাজের শ্রেণীবিন্যাসে এক বিরাট জটীলতা সৃষ্টি করিয়াছে; অথচ এই শ্রেণীবিন্যাসটি ভালভাবে বুঝিতে না পারিলে কৃষক আন্দোলনের গতি এবং প্রকৃতি বিচারে মারাত্মক ভুল হইবার সম্ভাবনা। সেনিন ধনতান্ত্রিক দেশের গ্রাম অঞ্চলের শ্রমজীবী ও শোষিত জনগণকে নিম্নোক্ত তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন—

(১) সর্বহারা ক্ষেতমজুর—যাহাদের নিজস্ব কোন জমি নাই এবং যাহাদের

তান্ত্রিক ভূমি ব্যবস্থার উচ্ছেদের লড়াইয়ে ভারতের কৃষকশ্রেণীর ভূমিকা

ধনিকের জমিতে নিজের শ্রম বেচিয়া জীবনধারণ করা ব্যতীত অন্য কোন উপায় নাই;

(২) অর্দ্ধ সর্ব্বহারা—যাহারা ক্ষেতমজুরের কাজ কিংবা কল কারখানার শ্রমিকের কাজ করা ছাড়াও কিছু জমিতে চাষ করে। সে জমি নিজের হইতে পারে কিংবা জমিদারের নিকট হইতে বন্দোবস্ত লওয়া হইতে পারে।

(৩) দরিদ্র কৃষক—যাহারা নিজের জমিতে মজুর না খাটাইয়া নিজেরাই চাষবাস করিয়া সংসার চালায়।

এই বিন্যাস সর্বহারার একনায়কত্বের যুগেই সম্ভব, তাহার পূর্বে নয়। কারণ "অনেক সময় গ্রাম্যমজুরকে গ্রাম্য মালিক তাহার নিজের স্বার্থে এক খণ্ড জমি দিয়া থাকে। সেই জন্য সমস্ত ধনতান্ত্রিক দেশেও সাধারণ গ্রাম্যমজুরের হাতে দুই একখণ্ড জমি দেখিতে পাওয়া যায়" (লেনিন—সিলেক্টেড ওয়ার্কস)। সুতরাং আমাদের দেশেও যাহাদের হাতে অল্প জমি আছে তাহাদিগকে গ্রাম্য সর্ব্বহারার পর্য্যায়ে ফেলা উচিত হইবে যদি ক্ষেত মজুরীই তাহার জীবন যাত্রার প্রধান অবলম্বন হয়। এই হিসাবে বিচার করিলে ভাগ চাষীদের শ্রেণী বিন্যাসে স্থান নিরূপন লইয়া যে বিতর্ক উঠে তাহা অনেকাংশে দূরীভূত হইবে।

ভাগ চাষীদের মধ্যে অধিকাংশই গ্রাম্য সর্ব্বহারার দলে। প্রথমোক্ত তালিকা হইতে এই কথা প্রমানিত হইবে। বাংলা দেশে কৃষকের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল মোট পরিবারের মধ্যে শতকরা ৩০.৪৬ টি ভূমিশূন্য ক্ষেত মজুর। ইহাদের নিজেদের কোন জমি জমা নাই; অন্যের জমিতে মজুরের কাজ করা ভিন্ন ইহাদের গোত্রান্তর নাই তথাপি ইহাদের একটি মোটা অংশ জোতদার জমিদারের নিকট হইতে জমি লইয়া নিজের যন্ত্রপাতি ও গরুবাছুর অনেক ক্ষেত্রে বিশেষ সর্ত্তে অন্যের যন্ত্রপাতি প্রভৃতি লইয়া চাষ আবাদ করে এবং ফসলের অর্দ্ধেক জোতদারকে দেয়। লেনিনের উপরোক্ত মন্তব্য হইতে ইহারা গ্রাম্য সর্ব্বহারা শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত তাহাতে সন্দেহ নাই। আবার ২ একর অর্থাৎ ৬ বিঘা পর্য্যন্ত যাহাদের জমির পরিমাণ তাহাদের সংখ্যা শতকরা ৩৬.৮৬ ভাগ ১৯৩৮-৩৯ সালে প্রতি একর জমিতে গড়ে ৭২৮ পাউণ্ড অর্থাৎ ৭ মনের মত (১০০ পাউণ্ডে ১মন) ধান ফলিত, বর্ত্তমানে ইহা আরও কমিয়া গিয়াছে। ফসলের এই পরিমাণ এবং পরিবার প্রতি গোণ্য সংখ্যা ৬ জন ধরিলে ইহাদের যে জমির ফসল হইতে সংসার চলিতে পারে না তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। সুতরাং পরিবার প্রতিপালনের জন্য হয় ইহাদিগকে অন্যের জমিতে ক্ষেত মজুরের কাজ করিতে হয় নয় ভাগে জমিদারের জমিতে চাষ করিতে হয়। ইহাদেরও গ্রাম্য সর্ব্বহারা ও অর্দ্ধ সর্ব্বহারার দলে স্থান পড়িবে। হিসাবে দেখা যায় পশ্চিমবাংলার মোট ৮৫ লক্ষ মেহনৎকারী জনসংখ্যার মধ্যে ৪০লক্ষ সর্ব্বহারা কৃষক, ২০ লক্ষ অর্দ্ধ সর্ব্বাহারা কৃষক। বাংলার হিসাব হইতে যাহা প্রমানিত হইল ভারতবর্ষের বেলায়ও তাহা মোটামুটী ভাবে খাটে। তাই বলিয়া সকল ভাগ চাষীরা যে সর্ব্বহারা বা অর্দ্ধ সর্ব্বহারার দলে তাহা নয়। জমিদার, জোতদার, ধনি কৃষক সকলেই অধিকার লাভের আশায় ভাগচাষের দ্বারা চাষ করায়। ইহারা গ্রাম্যধনিক শ্রেণীর অন্তর্গত।

জমিদারী জোতদারী মহাজনী প্রথার বিলোপ চাই

প্রত্যেক চাষীর বাঁচিবার মত জমি চাই

পুঁজিবাদী রাষ্ট্র বিরোধী শ্রমিক কৃষক ঐক্য চাই

গ্রাম্য সর্বহারা শ্রেণীর পৃথক সংগঠন গড়িয়া তুলিতে হইবে

কৃষক সংগঠন

এই শ্রেণী বিন্যাসের উপর লক্ষ্য রাখিয়াই কৃষক সংগঠন গড়িয়া তুলিতে হইবে। কোন গ্রামে সমগ্র কৃষক সমাজকে লইয়া একটি কৃষক সংগঠন গড়িলে ভুল হইবে। গরীব ও মাঝারী কৃষকদের লইয়া গড়িতে হইবে কৃষক সমিতি এবং ক্ষেতমজুরদের লইয়া তাহাদের ভিন্ন সংগঠন গড়িয়া তুলিতে হইবে। কারণ মাঝারী কৃষকরা সাধারণতঃ কৃষক সমিতি গুলির প্রধান শক্তি এবং তাহাদের স্বার্থের জন্য কৃষক সমিতির প্রধান সংগ্রাম জমিদারী জোতদারী প্রথার বিরুদ্ধে কিন্তু ক্ষেত মজুরের সংগ্রাম ত শুধু জমিদার জোতদারের বিরুদ্ধে নয়; যে মাঝারী কৃষক শ্রেণী তাহাকে দিয়া জমিতে চাষ বাস করায় তাহার বিরুদ্ধেও গ্রাম্য সর্ব্বহারার সংগ্রাম আছে। সুতরাং কৃষক সমিতি গুলিকে সে সন্দেহের চক্ষে দেখিবেই দেখিবে এবং তাহা সত্ত্বেও যদি তাহাদিগকে কৃষক সমিতির সহিত যুক্ত করিয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে সে সন্তুষ্ট হইতে পারে না, তাহার বহু দাবী অপূরিতই থাকিয়া যাইবে। সুতরাং লেনিনের "গ্রাম্য সর্ব্বহারাদের সতন্ত্রভাবে সংগঠিত করিবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে এবং সহরের শ্রমিকদের সহিত তাহাদিগকে মিলাইতে হইবে, কৃষক কমিটিতে তাহাদের প্রতিনিধি গ্রহণ করিতে হইবে" (সিলেকটেড ওয়ার্কস) এই উপদেশ অনুসারে মহাজন জমিদার, জোতদারের হাত হইতে মুক্তি, মজুরীবৃদ্ধি, ৮ ঘণ্টা কাজ, নিম্নতম মজুরী এবং সর্বপ্রধান জমি পাইবার দাবীর ভিত্তিতে তাহাদিগকে সংগঠিত করিতে হইবে। সহরের কল কারখানার সর্বহারা শ্রেণীর একাংশ হইল গ্রামের এই সর্বহারা দল। তাহাদের লইয়া এক বিশেষ ধরণের ট্রেড ইউনিয়ণ গড়িতে হইবে।

মাঝারী কৃষক, গরীব কৃষককে লইয়া কৃষক সমিতি গড়িতে হইবে। ইহাদের প্রধান দাবী হইবে মহাজনী, জোতদারী এবং জমিদারী প্রথার অবসান, প্রত্যেকের জন্য জমি। ক্ষেতমজুরের সংগঠন তাহার সহিত সংযুক্ত থাকিবে প্রতিষ্ঠান হিসাবে। একথা অবশ্য স্বীকার্য্য মাঝারী কৃষকের স্বার্থের সহিত ক্ষেতমজুরের স্বার্থে সংঘর্ষ হইতে বাধ্য কিন্তু তাই বলিয়া যে এই দুই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যুক্ত ফ্রন্ট গঠিত হইতে পারেনা এই ধারণা ভুল। উভয়ের বহুক্ষেত্রে একই শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হইবে, সেই সব স্থলে যুক্ত ফ্রন্ট গঠিত ত হইবেই; উপরন্তু আমাদের দেশে মাঝারী কৃষকের অধিকাংশই ক্ষেতমজুরকে শোষণ করে না; করে জোতদার জমিদাররা। সেই হিসাবে উভয়ের মধ্যে ঐক্য সম্ভবপর। কমরেড ষ্টালিনের এই সম্পর্কে বিশ্লেষণ উল্লেখযোগ্য। "মাঝারী কৃষকের চিত্ত দোদুল্যমান; একমাত্র ধনী চাষীদের বিরুদ্ধে দৃঢ় সংগ্রাম এবং গরীব কৃষকদের আরও বেশী সংগঠিত করিবার মধ্য দিয়াই মাঝারী কৃষকদের সাহত বুঝাপড়া স্থায়ী যইতে পারে। এই নীতি দৃঢ়ভাবে ধরিয়া না রাখিলে মাঝারী কৃষকেরা ধনী কৃষকদের দিকে ঝুঁকিবে" (লেনিনিজম্)। ক্ষেতমজুরের সংঘবদ্ধতা ও সংগ্রামী মনোভাবই মাঝারী ও গরীব কৃষককে বেশী করিয়া সংগ্রামী করিয়া তুলিবে।

কেন এই সংগঠন

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ব্যতীত কৃষি ব্যবস্থার পূর্ণ সংস্কার হইতে পারে না। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সর্ব্বহারা শ্রেণীর নেতৃত্বেই সংঘটিত হইতে পারে। অথচ ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে কি কলকারখানার শ্রমিক শ্রেণী কি গ্রাম্য সর্ব্বহারা শ্রেণী কেহই ঐক্যবদ্ধ ত নয়ই বরং বিভেদ ও বিভ্রান্তির মধ্যে আজ তাহারা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন এমন কি গ্রাম্য সর্ব্বহারার কোন সংগঠনই গড়িয়া উঠে নাই। দেশের মধ্যে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত আজও হয় নাই, বুর্জোয়া নেতৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিতই রহিয়াছে। সুতরাং যাহারা বিশ্বাস করে ভারতীয় পুঁজিবাদী রাষ্ট্রকে নিশ্চিহ্ন না করিয়াই কৃষকের দ্বারা কৃষিবিপ্লব সাফল্যমণ্ডিত হইবে তাহারা মার্কসবাদের বিরোধী চিন্তাই করে। টিটোর নেতৃত্বে যুগোশ্লাভ কম্যুনিষ্ট দল এই ভুলই করিয়াছে কৃষক শ্রেণীর ভূমিকা বিচারে। অথচ তেলেঙ্গানার লড়াই কৃষকের ক্ষমতা দখলের লড়াই, নয়াগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে পরিণত হইয়াছে। এ সংগ্রাম ব্যর্থ হইতে বাধ্য, হহা পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে উপযুক্ত সময়ের আগেই সংগ্রামের নির্দ্দেশ। শ্রমিক শ্রেণীর বিভেদ ও শ্রমিক নেতৃত্বের অভাবের সম্পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিয়া

(পরবর্ত্তী পৃষ্ঠায় ৪র্থ কলমে দেখুন)

চীনের মুক্তিকামী জনগণ

(১১শ পৃষ্ঠার পর)

তান্ত্রিক বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছে। এরা ভুলে যায় চীনের কম্যুনিষ্ট দলও প্রথম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কার্য্য অনুসারে গ্রামে গ্রামে পঞ্চায়েত গঠন করে চলেছিল, কিন্তু বাস্তব অবস্থা ও তা থেকে লব্ধ অভিজ্ঞতার জন্যই তাদের সে পথ ছেড়ে নোতুন করে পথ ধরতে হয়েছে। ফ্রান্সে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব যেমন 'ক্লাসিক' উদাহরণ হিসেবে আছে চীনের নয়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সেই রকম বিশিষ্ট স্থান; চীনেই নয়াগণতন্ত্রের জন্ম। সুতরাং ভাল করে বিবেচনা করে দেখতে হবে চীনের প্রকৃত অবস্থা। সামাজিক অবস্থা ও শ্রেণী বিন্যাসের সঠিক বিশ্লেষণের ভিত্তিতে গৃহিত কর্ম্মপন্থাই বিপ্লবকে সাফল্যমণ্ডিত করতে পারে; নয়ত মুখে সমাজতন্ত্রের কথা বললে কিংবা ভুল কৌশল অবলম্বন করে সর্বস্ব দিয়ে লড়লেও সাফল্যলাভ করা ত দূরের কথা বিপ্লবী শক্তি দুর্বল এবং শেষ পর্য্যন্ত পরাজিত হতে বাধ্য। এ কথাটা মনে রেখে চীনা বিপ্লবের আলোচনা করতে হবে।

বিপ্লবের দুই স্তর—বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক। চীনের বর্ত্তমান সমাজ আধা ঔপনিবেশিক ও আধা সামন্ততান্ত্রিক। এই সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্র ধ্বংসের কাজ সম্পন্ন না হলে সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠার কথা উঠতেই পারে না। এবং কেবলমাত্র এই অবস্থা শেষ করলেও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠন করা যেতে পারে না, বাস্তবভাবে যা গঠন করা সম্ভব তা হল—স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। আর এই শেষ করার কাজও বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কাজ। সুতরাং চীন বিপ্লবের স্তর বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে। ১৯শ শতকে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবগুলির নেতৃত্ব করেছিল ধনিক শ্রেণী। তার কারণ সেই সময় ধনিক শ্রেণীর সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে বিপ্লবী ভূমিকা ছিল এবং শ্রমিক শ্রেণীর শ্রেণী হিসেবে শক্তিশালী না হওয়ায় বিপ্লবে নেতৃত্ব দেবার অক্ষমতা। বর্ত্তমানে সাম্রাজ্যবাদের যুগে ধনিক শ্রেণীর সে বিপ্লবী চরিত্র নেই; তারা পরিষ্কারভাবেই জানে আজকে কোন আন্দোলন আরম্ভ করলে তাদের হাতে সে আন্দোলনের নেতৃত্ব থাকবেনা শ্রমিক শ্রেণীর হাতে তা চলে যাবে তাই তারা জনগণের সঙ্গে বিপ্লবের পথে না গিয়ে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে আপোষের মারফত কিছু কিছু সংস্কার করে নিজেদের স্বার্থকে বাঁচিয়ে রাখতে চায়। সুতরাং বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবে আজকে আর বুর্জোয়া শ্রেণী নেতৃত্ব দিতে পারে না। ধনিক শ্রেণীর এই অক্ষমতায় এবং শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবী ভূমিকার জন্য অন্যান্য গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বেই বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করে। উপরন্তু এই বিপ্লবগুলি আর পুরাণ দিনের সম্পূর্ণরূপে বুর্জোয়া পরিচালিত বিপ্লব নয় যার একমাত্র লক্ষ্য ছিল ধনতান্ত্রিক সমাজ গঠণ এবং বুর্জোয়া স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা। বরং কোথাও আংশিকভাবে কোথাও পূর্ণভাবে শ্রমিক শ্রেণী এই বিপ্লবগুলিকে পরিচালিত করার ফলে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে ক্রমে ক্রমে চালিত করাই শ্রমিক শ্রেণীর উদ্দেশ্য। চীনের বেলায়ও এ কথা ঠিক। চীনের ধনিক শ্রেণী আজ ইঙ্গমার্কিন সাম্রাজ্যবাদের তাঁবেদার এবং সামন্ততন্ত্রের সহিত আপোষকামী; সুতরাং তাদের দ্বারা চীনের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পূর্ণ হতে পারে না। অন্যদিকে আবার চীনের শ্রমিক শ্রেণী সুগঠিত, নেতৃত্ব দেবার উপযুক্তও। সুতরাং স্বভাবতঃই চীনা শ্রমিক শ্রেণীর এই বিপ্লবে নেতৃত্ব দেবার দায়িত্ব। সেই দায়িত্বই পালিত হচ্ছে।

এখন একটা প্রশ্ন থেকে যায়—এই দুই বিপ্লবের স্তরকে এক স্তরে সমাপ্ত করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে কিনা? এর একমাত্র উত্তর না। বিপ্লবের কালে বিপ্লবী নেতৃত্বের পেছনে উপযুক্ত রাজনৈতিক ধ্বনি এবং কৌশলের দ্বারা দেশের মধ্যের যতদূর সম্ভব বেশী শক্তিকে টেনে আনতে হবে। এর জন্যে প্রয়োজন প্রত্যেকটি শ্রেণী উপশ্রেণীর ভূমিকার সঠিক বিচার। আজ চীনের মজুর, চাষী, এবং নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বুদ্ধিজীবি ও অন্যান্য অংশের ওপরই নির্ভর করছে চীনের বিপ্লবের ভবিষ্যত। বিপ্লবী নেতৃত্বের অধীনে এদের টেনে আনতে হবে। সুতরাং আজই যদি সমাজতান্ত্রিক কৃষি ব্যবস্থার গঠনের উদ্দেশ্যে সংগ্রাম আরম্ভ করে দেওয়া হয় তাহলে বিপ্লবের reserve শক্তি কৃষকেরা প্রতিবিপ্লবীর সঙ্গে যোগ দিয়ে বিপ্লবের পরাজয়ের পথ তৈরী করবে। কিংবা যদি আজই সমস্ত ব্যক্তিগত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয় তা হলে মধ্যবিত্ত শ্রেণী একাংশকে হারাতে হবে শুধু তাই নয় চীনের অর্থনৈতিক অবস্থা এখন যেরকম অনুন্নত আছে তাতে তাকে উন্নত করতে হলে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার সাহায্য দরকার যেহেতু সমাজতান্ত্রিক প্ল্যানিং গ্রহণ করতে হলে কলকারখানা শিল্প প্রভৃতির যেভাবে উন্নতি দরকার চীনে রাষ্ট্রের পক্ষে করা তা সম্ভব নয় একক প্রচেষ্টায়। কিন্তু যাতে ঐ ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় জনসাধারণের জীবিকা বিপন্ন না হয় সে দিকে দৃষ্টি সজাগ রাখে জনগণের বিপ্লবী নেতৃত্ব। সুতরাং "চাষীই হবে জমির মালিক" এবং জনসাধারণের জীবিকা বিপন্ন না হওয়া পর্য্যন্ত পুঁজি খাটাবার স্বাধীনতা বর্ত্তমানের নীতি এবং ধ্বনি হতে হবে। সুতরাং গণতান্ত্রিক স্তর ও সমাজতান্ত্রিক স্তরের কাজ একসঙ্গে শেষ করতে যাওয়া হবে প্রচণ্ড নির্বুদ্ধিতা; "এক আঘাতে যতটুকু শেষ"—এ নীতি বাস্তবসম্পর্কশূন্য ভাববাদ। রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর লেনিনকে অনেকটা পেছু হটে "নয়া অর্থনৈতিক পরিকল্পনা" গ্রহণ করতে হয়েছিল দেশকে সমাজতান্ত্রিক প্ল্যানিং এর উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে। চীনে নয়া গণতন্ত্রের মধ্য দিয়ে সেই চেষ্টাই হচ্ছে; মুক্তচীনের সর্ববিষয়ে সফলতা ও কুয়োমিনটাঙের পরাজয়ের পর পরাজয় চীনা কম্যুনিষ্ট দলের ঠিক কর্ম্মপন্থা গ্রহনের পরিচায়ক, তার সফল পরিসমাপ্তির মধ্যে দিয়ে চীনে সমাজতন্ত্র কায়েম হবে।

ভারতবাসীর কর্ত্তব্য

মহাচীনের জনগণের এই সংগ্রামে ভারতবর্ষের বিপ্লবী জনতা কেমন করে সাহায্য করবে? সাহায্য করার একটি মাত্র পথ আছে তাই আমাদের গ্রহণ করতে হবে। চীনের বিপ্লব সামন্ততন্ত্র, সাম্রাজ্যবাদ ও তার সাহায্যকারী দেশীয় পুঁজিবাদী ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে। আন্তর্জাতীক শোষণের শৃঙ্খলের একপ্রান্ত ছিঁড়তে চেষ্টা করছে মুক্ত চীন, আমাদের প্রান্তেও তাকে ছিঁড়তে হবে। তবে তা নয়াগণতন্ত্রের কৌশলে নয়। ভারতবর্ষ ও চীনের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অবস্থা এক নয়, চীনের আধা সামন্ততান্ত্রিক আধা উপনিবেশিক বিশেষ অবস্থায় যে কৌশল ঠিক, ভারতবর্ষের—মূলতঃ পুঁজিবাদী অবস্থায় (সাম্রাজ্যবাদের যুগে ঔপনিবেশিক পুঁজিবাদের যতটুকু বৃদ্ধি সম্ভব) তা ঠিক নয়। ভারতবর্ষের শোষিত শ্রেণী উপশ্রেণীগুলির মিলিত পুঁজিবাদ বিরোধী ঐক্য ফ্রন্ট সমাজতান্ত্রিক কার্য্যসূচীর মধ্যে দিয়ে ভারতবর্ষ থেকে সাম্রাজ্যবাদ সামন্ততন্ত্র এবং দেশীয় পুঁজিবাদী শোষণকে দূর করতে পারে এবং করতেও হবে যেহেতু ভারতবর্ষের সংগ্রাম মূলতঃ পুঁজিবাদী রাষ্ট্র বিরোধী। আর নিজের দেশের শোষণশৃঙ্খলকে ছিঁড়তে পারলেই বিপ্লবী চীনকে সাহায্য করা হবে সবচেয়ে বেশী।

কৃষক

(১৩শ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

পুঁজিবাদী ভারতীয় রাষ্ট্র এই সংগ্রামী জনশক্তিকে ফ্যাসিবাদী আক্রমণে ধ্বংস করিবার সুযোগ পাইল। ইহার জন্য দায়ী কে হইবে?

কিন্তু বিপ্লবের প্রস্তুতিতে Romanticism, ভাবালুকতার স্থান নাই। আঘাত হানিবার মত শক্তি না পাইলে এবং চিন্তাগত ও ক্ষেত্রগত নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিলে সফল বিপ্লব সম্ভবপর হইতে পারে না। বর্ত্তমানে সংগঠন গুলির মধ্য দিয়া সেই কাজই করিতে হইবে। অর্থাৎ মূল লক্ষ্যে পৌছিবার উদ্দেশ্যেই চাষীর অর্থনৈতিক দাবীদাওয়ার সংগ্রামের মধ্য দিয়া কৃষক সমাজকে শ্রমিক শ্রেণীর বন্ধুর দলে টানিয়া আনিতে হইবে। শ্রমিক বিপ্লবের সাংগঠনিক প্রস্তুতি ও বিপ্লবী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠাই হইবে কৃষক সংগঠনের কাজ। যদি এইদিকে সফল হইতে পারা যায় এবং ভারতের কৃষক শ্রেণীকে শ্রমিকের পাশে বন্ধু হিসাবে পাওয়া যায় তবেই বিপ্লব সফল হইবে। কৃষকই বিপ্লবের Reserve force; ধনিকের বা শ্রমিকের যে দিকে ইহারা যোগ দিবে জয় তাহারই হইবে—এই কথা বিবেচনা করিয়াই গ্রাম্য সর্ব্বহারা প্রতিষ্ঠান ও কৃষক সমিতিগুলিকে পরিচালিত করিতে হইবে

নভেম্বর বিপ্লবের তাৎপর্য

(১৭শ পৃষ্ঠার পর)

রাশিয়ায় যেমন অল্পদিনের মধ্যে বিপ্লব সফল হইয়াছিল সেই রকম অল্পসময়ে বর্ত্তমানে কোন দেশের বিপ্লবই সফল হইতে পারে না। প্রতিটি দেশের নিজস্ব বিপ্লবও আজ তাই দীর্ঘকাল স্থায়ী যুদ্ধের রূপ লইতে বাধ্য। শুধু তাই নয় কোন পুঁজিবাদী দেশে বিপ্লব আরম্ভ হইলে বিশ্ব পুঁজিবাদও নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারে না, তাহার সমস্ত শক্তি লইয়াই সেই পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের পিছনে আসিয়া দাঁড়াইবে। ইহাকে প্রতিরোধ করিতে হইলে চাই অন্যান্য দেশের গণতন্ত্রী সমাজতন্ত্রী শক্তিগুলির সাহায্য। সেই অবস্থায় যুদ্ধকে ঠেকাইবার কোন উপায় থাকিবে না বিশেষ করিয়া পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলি যুদ্ধের জন্য যখন উন্মুখ। এই সব বিষয় বিবেচনা করিলে বলা যায়—তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী।

যুদ্ধ যখন বাধিবেই তখন ইচ্ছা না থাকিলেও গণতন্ত্রী সমাজতন্ত্রী শক্তিগুলির তাহাতে অংশ গ্রহণ করিতেই হইবে। কিন্তু তাহাদের যুদ্ধের চরিত্র এবং সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদী শক্তির যুদ্ধের চরিত্রের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ—দুইটি সম্পূর্ণ বিপরিত ধর্ম্মী। সাম্রাজ্যবাদ যুদ্ধ বাধাইবে জনসাধারণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিজের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ রক্ষার্থে; সেই হিসাবে তাহার যে যুদ্ধোদ্যম আক্রমন ধর্ম্মী কিন্তু সোভিয়েট ইউনিয়ন ও নয়া গণতান্ত্রিক দেশগুলির পক্ষে তাহা নয়। তাহাদের জনস্বার্থ রক্ষার প্রচেষ্টায় যুদ্ধে নামিতে বাধ্য হওয়া সেই অর্থে আত্মরক্ষাধর্ম্মী। সুতরাং এই দুই পরস্পর বিরোধী যুদ্ধ প্রচেষ্টার মধ্যে জনসাধারণকে ঠিক পথ বাছিয়া লইতে হইবে এবং তাহার একটি মাত্রই উপায় আছে। গণতন্ত্রী সমাজতন্ত্রী শক্তির সহিত মিলিত হইয়া জনস্বার্থ রক্ষার্থে সাম্রাজ্যবাদকে ধ্বংস করাই সেই উপায়।

যাঁহারা বিশ্বাস করেন পুঁজিবাদ তাহার সমস্যার জন্য আপনা আপনি ভাঙ্গিয়া পড়িবে শেষ শ্রেণীসংগ্রামের প্রয়োজন হইবে না তাঁহারা ভুলিয়া যান পুঁজিবাদী সমস্যা কাটাইবার জন্যই পুঁজিবাদী দেশগুলি যুদ্ধ বাধাইয়া দেয়। আগে যাহা বিভিন্ন পুঁজিবাদী দেশগুলির মধ্যে সংঘটিত হইয়াছে আজ তাহা বাস্তব অবস্থার পরিবর্ত্তনের জন্য সোভিয়েট রাশিয়া ও নয়া গণতান্ত্রিক দেশগুলির বিরুদ্ধে চালিত হইবে। সুতরাং পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক

(শেষাংশ ১৮শ পৃষ্ঠায়)

বাস্তুহারা—ধনিকশ্রেণীর স্বার্থ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে কোটী কোটী লোককে গৃহহারা সর্ব্বহারা করা হইয়াছে

পরাধীন ভারতবর্ষের নিকট হইতে প্রাপ্ত বহু সমস্যা ব্যতীত ভারতবর্ষে নিত্য নব সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে এবং হইতেছেও। যে গুলি ইতিমধ্যে দেখা দিয়াছে তাহাদের মধ্যে একটির আবার নেতাদের স্বাধীন ভারতের সহিত সম্পর্ক এত গভীর যে স্বাধীনতার অখণ্ডিত্ব মাউন্টব্যাটেন সাহেবের ঝোলা হইতে বাহির হইবার আগে যখন পুরাদমে মহড়া চলিতেছিল তখনই তাহার প্রকাশ ভাল ভাবেই হইয়া গিয়াছে। এহেন সমস্যাকে যদি স্বাধীনতার সমস্যা বলা হয় তাহা হইলে নিশ্চয়ই কিছু মনে করিবার নাই। নেতাদের মুখ হইতে শোনা যায় ইংরাজ ভারত ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার পর শিশু ভারতীয় রাষ্ট্র বহুবিধ সমস্যা দেখা দিতে বাধ্য এবং দেশের আপামর জনসাধারণ তাহা হইতে নিস্কৃতি পাইতে পারে না। সেই হিসাবে টাটা বিড়লা হইতে আরম্ভ করিয়া বিখ্যাত জাতীয় নেতৃবৃন্দ হইয়া দীনতম মজুর পর্য্যন্ত যে কেহই নাকি একটি না একটি সমস্যায় প্রপীড়িত। নেতাদের যে সমস্যা থাকিতে পারে তাহা আমরা জানিতাম না; অবশ্য বর্ত্তমানে তাঁহাদের যে একটি দেখা দিয়াছে তাহার খবর পাওয়া গিয়াছে। ভারতীয় মন্ত্রিমণ্ডলী ভাবিয়া ভাবিয়া অস্থির হইয়া উঠিয়াছেন কেমন করিয়া আন্তর্জাতীক ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের সম্মান বজায় রাখা যায়। সমস্যা কাটাইবার জন্য তাঁহারা যে উপায়টি গ্রহণ করিয়াছেন তাহার অভিনবত্বে সমস্যা কাটিব কাটিব হইতেছে, অবশ্য তাঁহাদের মতে, আর তাঁহারাও এ যাত্রা বাঁচিয়া গেলেন। কম মাহিনা বা ভাতা লইলে পাছে ভারতবর্ষের প্রভাব প্রতিপত্তি, সুনাম সম্মান বিশ্বের বাজারে নামিয়া যায় এই ভয়ে তাঁহারা কেহ মাসিক কয়েক হাজার কেহ লক্ষ্যাধিক মুদ্রা লইতেছেন। ইহাতেও আদর আপ্যায়নের ত্রুটী হয় দেখিয়া তাঁহারা নিজেদের জন্য নূতন নূতন দামী মোটর গাড়ী, এরোপ্লেন প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহাতেই সমস্যা অনেকটা সহজ হইয়া আসিয়াছে; আরো যদি সহজ করার দরকার পড়ে তাহা হইলে পারিশ্রমিকের হার আর এক ধাপ উঠাইয়া দিলে কিংবা দপ্তর সাজাইবার জন্য আরো অর্দ্ধ কোটী মুদ্রা খরচ করিলে হাঙ্গামা চুকিয়া যাইবে—নেতাদের দিবা নিদ্রার দিব্য আরামে ব্যাঘাত ঘটিবে না। টাটা বিড়লার অবশ্য ভাবনা আছে—কেমন করিয়া লাভের অঙ্ক বৃদ্ধি করিয়া জাতীয় মানে তাঁহাদের সম্পদ বাড়ান যায়। ইতিমধ্যে তাঁহারা শিল্প লাভ মান ১০০ হইতে ৮০০র মত তুলিয়াছেন আরও যাহাতে বাড়ে তাহার জন্য জাতীয় সরকার বাড়তি লাভের ট্যাক্স প্রভৃতি মুকুব করিবার জন্য আগাইয়া আসিয়াছেন, মজুরকে ছাঁটাই করিবার ও তাহাদের বেতন বাঁধিয়া দিবার সুপারীশও স্বীকৃত হইয়াছে। সুতরাং প্রায় সকলেরই সমস্যার সমাধান হইয়াছে জনসাধারনের ছাড়া। তাহাদের সমস্যা গুলি কমিবার পরিবর্ত্তে দিনের পর দিন রক্তবীজের বংশের মত বাড়িয়াই চলিয়াছে। ইহাদের মধ্যের একটি হইল উপরোক্ত স্বাধীনতার সমস্যা—নেতারা যাহাকে বাস্তুত্যাগী সমস্যা বলেন; অন্যান্য সকলে ইহাকে অবশ্য বাস্তুহারা সমস্যাই বলেন। কিন্তু কথা দুইটি শুনিতে প্রায় এক রকম হইলেও প্রভেদ তাহাদের প্রচণ্ড। জনসাধারণ কি ইচ্ছা করিয়া দশপুরুষের ভিটা মাটি ছাড়িল, না ছাড়িতে বাধ্য হইল এই প্রশ্নের সঠিক উত্তরের উপরই সমস্যার নামকরণ হইবে।

জাতীয় নেতাদের দেশদ্রোহীতার ফল বাস্তুহারা সমস্যা

দরিদ্র জনসাধারণ নিছক সখ করিয়া দশপুরুষের ভিটামাটি ছাড়িয়া সারা জীবনের সামান্য সঞ্চয় ফেলিয়া সর্ব্বহারা ভিক্ষুকের মত অনিশ্চিতের পিছনে ছুটিয়া আসিতে পারে না, আসেও নাই। তাহারা আসিতে বাধ্য হইয়াছে হইতেছেও। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হইবার অব্যবহিত পরে সারা ভারতবর্ষে যে গণআন্দোলনের ঢেউ জাগিয়া উঠে সাম্রাজ্যবাদী শোষণকে চিরতরে দূর করিবার জন্য তাহার ক্রমবর্দ্ধমান ব্যাপকতা ও গভীরতা ভারতীয় ধনিককে চিন্তিত ও সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। তাহারা পরিষ্কার বুঝিয়াছিল যে, গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়া সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছেদ ঘটিলে ভারতবর্ষে পুঁজিবাদী শোষণ ও শাসন কায়েম করিবার কোন সম্ভাবনাই থাকিবে না; জনসাধারণ নিজেরাই নিজেদের রাষ্ট্র গঠন করিবে। সুতরাং ভারতীয় পুঁজিবাদী শ্রেণীর চেষ্টা হইল কেমন করিয়া এই গণআন্দোলনকে পিছন হইতে আঘাত হানিয়া বন্ধ করিয়া দিয়া নিজেদের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা গ্রহণ করা যায়। এই উদ্দেশ্যেই ভারতীয় পুঁজিবাদী শ্রেণীর প্রতিনিধি কংগ্রেসের জাতীয় নেতৃত্ব আন্দোলনকে ধ্বংস করিবার এবং নিজেদের শ্রেণী স্বার্থ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য সাম্রাজ্যবাদের সহিত আপোষের মারফত রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করিতে সচেষ্ট হইল। কিন্তু ক্ষমতা দখলের এই প্রচেষ্টায় কংগ্রেসের ঔপনিবেশিক পুঁজিবাদী জাতীয় নেতৃত্বের সহিত সংঘর্ষ বাধিল মোসলেম লীগের সামন্ততন্ত্র ঘেষা অপেক্ষাকৃত কম উন্নত মুসলমান পুঁজিবাদী নেতৃত্বের। সাম্প্রদায়িকতার বিষাক্ত বাষ্পে আচ্ছন্ন করিয়া, বহু কিছু লোভ দেখাইয়া জন সাধারণকে টানিয়া লইয়া আনা হইল এই দুই বিরুদ্ধ কায়েমী স্বার্থের পিছনে—সাধারণ হিন্দু ও মুসলমান হইয়া উঠিল পুঁজিবাদী স্বার্থান্বেষী নেতৃত্বের হাতের অস্ত্র। ইহাতে একদিকে যেমন সাধারণ হিন্দু মুসলমানের ঐক্যবদ্ধতাকে চূর্ণ করিয়া সংগ্রামী গণআন্দোলনের বদলে সাম্প্রদায়িকতার জোয়ার বহাইয়া দেওয়া গেল অন্যদিকে তেমনই বিপথে পরিচালিত গণশক্তিকে নিজেদের পিছনে আনিয়া সাম্রাজ্যবাদের সহিত দর দস্তুরের সুবিধা হইল। বৃটীশ সাম্রাজ্যবাদ ইহার সুযোগ লইয়া এতদিনের সাধনা—ঐক্যবদ্ধ অখণ্ড প্রকৃত স্বাধীন ভারতবর্ষের চিন্তাকে বানচাল করিয়া দিল। জন্ম লইল—ভারতীয় ইউনিয়ন ও পাকিস্তান, বিচ্ছিন্ন, সাম্রাজ্যবাদের তাবেদার দুর্বল রাষ্ট্র। গণঅভ্যুত্থান ভীত জাতীয় নেতৃত্ব বিনা সংগ্রামে আপোষের মধ্য দিয়া যথাসাধ্য শ্রেণী শোষণ কায়েম করিবার সুযোগ পাইয়া ইহাতেই রাজী হইয়া গেল। ভারত ব্যাবচ্ছেদের পরিণতি বাংলা পাঞ্জাব বিভাগ; তাহারই ফল বাস্তুহারা সমস্যা। লক্ষ লক্ষ হস্তের আততায়ীর গোপন ও প্রকাশ্য অস্ত্র যে সম্প্রীতির বন্ধনকে টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়াছে নেতাদের প্ররোচনায় নেতাদেরই স্বার্থরক্ষায় তাহাকে ফিরাইয়া নেতারা আনিবেন না ইহা ঠিক।

কংগ্রেসী দরদের নমুনা

ক্ষমতার লড়াই এর সে পর্ব্ব আজ শেষ হইয়াছে। লক্ষ জনতার বুকের রক্তের বিনিময়ে নেতারা রাষ্ট্রক্ষমতা করায়ত্ত করিয়াছেন। আজ তাঁহারা নিশ্চিন্তে শাসন ও শোষণ চালাইতে চাহেন। সুতরাং একদিন যাহাদিগকে উত্তেজিত করিয়া সাম্প্রদায়িকতার মারণ যজ্ঞে তাঁহারা মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন যাহাদিগকে স্বর্গের নন্দন কানন আনিয়া দিবেন বলিয়া আশ্বাস দিয়াছিলেন তাহারাই যখন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণে কিংবা বিনা কারণে শুধু ভয়ে সেই নেতাদের নিকট আসিয়া ঘর বাড়ী চাহিয়া বসিল, জমি জমা, চাকুরী সংস্থান চাহিয়া বসিল তখন তাহাদের কপালে জুটিল অজস্র অপমান।

পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আজ পর্য্যন্ত ২০ লক্ষের মত বাস্তুহারা পশ্চিম বঙ্গে আসিয়াছেন। তাঁহাদের জন্য পশ্চিম বাংলার কংগ্রেসী সরকার যে ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা বলিতে লজ্জা বোধ করা উচিত। অথচ কোন এক বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা কংগ্রেসী সরকারকে উপদেশ দিয়াছেন—"কয়েকটি পরিবারের বসবাসের ব্যবস্থা করিবা মাত্রই পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আরও লোক চলিয়া আসিবেন।" ইহাদ্বারা সরকারকে কি বাস্তুহারার বসবাসের উপায় করিতে বারণ করা হয় নাই! পশ্চিমবাংলা সরকার সে উপদেশ ভালভাবেই শুনিয়াছেন যে তাহার প্রমাণ যথেষ্টই মিলিয়াছে মিলিতেছেও। শিয়ালদহ রেলষ্টেশনে যেভাবে পশুর মত জীবন

নীলিমা দত্ত

যাপন করিতে বাধ্য হইতেছেন অসংখ্য পরিবার, কলেরা প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধিতে যাহাদিগকে উজাড় হইয়া যাইতে হইতেছে তাঁহাদের ব্যবস্থার কথাই মনে পড়ে না নেতাদের, ২০ লক্ষের মধ্যে বড় জোর কয়েক হাজার লোককে আশ্রয় দেওয়া হইয়াছে। মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিবারকালে শোনা গিয়াছিল কলিকাতায় যে সমস্ত বড় বড় বাড়ী খালি পড়িয়া আছে কিংবা যেগুলিতে আরও বহু পরিবার বাস করিতে পারে তাহাদিগকে দখল করিয়া বাস্তুহারাদের বসবাসের ব্যবস্থা করা হইবে। আজ পর্য্যন্ত তাহাত হয় নাই উপরন্তু বহু এইরূপ বাড়ীর সন্ধান মন্ত্রীমণ্ডলীকে দেওয়া সত্ত্বেও পুনঃ পুনঃ তাগাদা দিবার পর জবাব আসিয়াছে ঐসব বাড়ি দখল Bad in Law। Bad in Law না হইয়া উপায় নাই যেহেতু বাড়ীগুলি বড়লোকের মন্ত্রিদের বন্ধু বান্ধব বা বন্ধুদের বন্ধুবান্ধবদের। বেআইনি আইন অর্ডিন্যান্স চালু করিতে আপত্তি, নাই জনতাকে নিষ্পেষন আর অত্যাচারে ঠাণ্ডা বানাইবে কিন্তু জনসাধারণের

(১৮শ পৃঃ দেখুন)

নভেম্বর বিপ্লবের তাৎপর্য্য ও শিক্ষা

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

মার্কসবাদের একমাত্র রক্ষা ও ভাষ্যকার বলিয়া দাবী ফাঁকা আওয়াজ বলিয়া সর্বসমক্ষে প্রমাণিত হইয়া গেল। সোস্যাল ডিমোক্রাসি বিপ্লবী মার্কসবাদ হইতে ভিন্ন না হইয়া পারিল না। চিন্তা-জগতের এই বিভেদ ব্যবহারিক জগতে আচার ব্যবহারের মধ্য দিয়া ফুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্বে পরিচালিত সর্বপ্রথম এবং একমাত্র সমাজতান্ত্রিক দেশ সোস্যাল ডিমোক্র্যাটদের বিষাক্ত আক্রমণ এবং প্রকাশ্য শত্রুতারই লক্ষ্যস্থলে পরিণত হইল। সারা পৃথিবীর ধনিক শ্রেণীর সহিত পা মিলাইয়া সোস্যাল ডিমোক্র্যাসি সোভিয়েটের বিরুদ্ধে মাতিয়া উঠিয়াছে। তাহাদের এই ব্যবহারে তাহাদের প্রকৃত শ্রেণী চরিত্রই প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে; এতদিনের ধাপ্পাবাজীর মুখোস খুলিয়া গিয়াছে। ইহারই ফলে সোস্যাল ডিমোক্র্যাসি হইতে মুক্ত করিয়া শ্রমিক আন্দোলনকে বিপ্লবী মার্কসবাদ লেনিনবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে এক নূতন যুগের সৃষ্টি করিয়াছে নভেম্বর বিপ্লব।

• বিশ্বের শোষিত নিপীড়িত জনতার ভরসা স্থল সোভিয়েট ইউনিয়ন

বিশ্বের গণমুক্তি আন্দোলন যে আজ সোভিয়েট নেতৃত্বকে অস্বীকার করিয়া পরিচালনা করিবার উপায় নাই কিংবা সোভিয়েট নীতি যে বিশ্বের সর্বহারা বিপ্লবী আন্দোলনকে ধীরে ধীরে শক্তিশালী করিয়া শেষ শ্রেণী সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করিতেছে একথা অস্বীকার যাঁহারা করিতেছেন তাঁহারা আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দুর্বল করিতেই চাহিতেছেন। এ দলে পড়েন ট্রট্স্কিপন্থীরা কিংবা ট্রটস্কির "পার্মানেন্ট বিপ্লব" চিন্তাধারা প্রভাবিত তথাকথিত মার্কসবাদী দলগুলি। সোভিয়েট রাশিয়ার বিপ্লবী ভূমিকা সম্বন্ধে তাঁহাদের ভুল বিশ্লেষণ চিন্তা জগতে তাঁহাদের দৈন্যই প্রমাণ করে; নভেম্বর বিপ্লবের প্রধান দুইটি বৈশিষ্ট তাঁহাদের নজরে পড়ে না। এই দুইটি মূল বৈশিষ্টের "প্রথমটি হইতেছে আমাদের দেশের সর্বহারা শ্রেণী ও শ্রমজীবী কৃষক শ্রেণীর বন্ধুত্ব এবং সর্বহারার নেতৃত্বে পরিচালিত ঐক্যবদ্ধতার ভিত্তিতেই সর্বহারার একনায়কত্ব গড়িয়া উঠিয়াছে এবং দ্বিতীয়তঃ আমাদের দেশে সর্বহারার একনায়কত্ব একদেশে সমাজতন্ত্রের বিজয়ের ফলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে" (লেনিনিজম পৃষ্ঠা ৯৬)। একথা গুলির অর্থ কি? বিপ্লবের সময় মিত্র চিনিয়া লওয়া কিংবা ক্ষমতাদখলের সংগ্রামে সর্বহারা শ্রেণীর বন্ধু হিসাবে দেশের মধ্যের অগণিত শ্রমজীবী শ্রেণী উপশ্রেণী গুলিকে টানিয়া আনার উপরই বিপ্লবে জয়লাভ কিংবা পরাজয় নির্ভর করে। বুর্জোয়া শ্রেণীর সহিত ক্ষমতার লড়াইয়ে যদি বুর্জোয়া শ্রেণী এই বিরাট শ্রমজীবী অংশকে তাহার কর্তৃতাধীনে আনিতে পারে তাহা হইলে তাহার জয় সুনিশ্চিত আর যদি শ্রমিক শ্রেণী তাহাদিগকে মিত্র হিসাবে পায় তাহা হইলে ক্ষমতা তাহার করায়ত্ত হইবেই। কৃষক ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর শ্রমজীবী এই বিরাট শক্তিই বিপ্লবের reserve শক্তি, যে দলে তাহারা যোগ দিবে জয় তাহারই হইবে। সুতরাং বিপ্লবে এই কৃষক শ্রেণীর ভূমিকা বিচার করিতে ভুল করিয়া বিপ্লবে জয়ের আশা বাতুলতা। অথচ এই ভুলই ট্রটস্কি করিয়াছিলেন এবং ট্রটস্কিবাদ প্রভাবিতরাও করিতেছেন। ট্রটস্কির ১৯০৫ সালের "পার্মানেন্ট বিপ্লব" কিংবা ১৯১৫ সালের "ক্ষমতার জন্য লড়াই" এর কথা বাদ দিলেও ১৯২২ সালে লিখিত "১৯০৫ সাল" নামক পুস্তকের ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছেন —"সর্বহারা শ্রেণীর অগ্রগামী অংশ রাষ্ট্রক্ষমতা করায়ত্ত করিয়া কেবলমাত্র সামন্ততান্ত্রিক সম্পত্তির উচ্ছেদ সাধনের চেষ্টা করিবে তাহা নয়, বুর্জোয়া শ্রেণীর সম্পত্তির উচ্ছেদও করিবে। ফলে বুর্জোয়া শ্রেণীর যে অংশ বিপ্লবের প্রথম পর্যায়ে তাহাকে সাহায্য করিয়াছিল শুধু তাহারই সহিত তাহার সংঘর্ষ বাধিবে তাহা নয় যে বিরাট কৃষক শ্রেণী প্রকৃতপক্ষে তাহাকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করিয়াছে তাহার সহিতও তাহার সংঘর্ষ বাধিবে। অধিক সংখ্যক কৃষক সমন্বিত অনগ্রসর দেশের শ্রমিক সরকারের এই অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বের সমাধান বিশ্ব শ্রমিক বিপ্লবের দ্বারাই হইতে পারে"। এই চিন্তাধারা লেনিনের "সর্বহারার একনায়কত্ব" মতবাদের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। লেনিন যেখানে সর্বহারার একনায়কত্বকে "Special form of class alliance between the proletariat and the labouring masses of the peasantry" মনে করেন ট্রট্স্কি সেখানে তাহাকে সম্পূর্ণরূপে "hostile collision between the proletariat vanguard and the broad masses of the peasantry" ধরিয়াছেন; লেনিন যেখানে শ্রমজীবী কৃষক শ্রেণীর উপর সর্বহারার নেতৃত্বের কথা চিন্তা করিয়াছেন ট্রট্স্কি সেখানে কোন নেতৃত্বই দেখিতে পান নাই বরং "contradictions in position of a workers' Government in a backward country with over whelming majority of Peasants" তাঁহার চোখে পড়িয়াছে; লেনিন যেখানে রাশিয়ার কৃষকের নিকট হইতে বিপ্লবের শক্তি পাইবার কথা বলিয়াছেন ট্রটস্কি সেখানে বিপ্লবের শক্তির কোন পরিচয়ই তাহাতে দেখেন নাই কেবলমাত্র "in the arena of world proletarian revolution" তেই তাহার সমাধান দেখিয়াছেন। ট্রটস্কির "পার্মানেন্ট বিপ্লব" তাই শুধু বিপ্লবে কৃষক শ্রেণীর ভূমিকায় উপযুক্ত মূল্য দেয় নাই তাহা নহে সমগ্র কৃষক আন্দোলনের চরিত্রই বুঝিতে পারে নাই। ইহাদের এই বিচ্যুতির কারণ সর্বহারার একনায়কত্বকে ইহারা "Special form of class alliance between the Proletariat and the labouring masses of the peasantry for the purpose of overthrowing Capital, for achieving final victory of Socialism" মনে না করিয়া ইহাকে "Governing upper Stratum skillfully selected by the careful hand of an experienced strategist and judiciously relying on the support of one section or another of the population" মনে করেন। সর্বহারার একনায়কত্বে যাঁহারা উপরোক্ত ভাবে চিন্তা করেন তাঁহারা "সর্বহারার একনায়ত্ব" মতবাদের সঠিক প্রয়োগের মারফৎ সোভিয়েট রাশিয়ায় যে রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার প্রকৃত বিপ্লবী ভূমিকা কেমন করিয়া বুঝিবেন? এইত গেল প্রথম বৈশিষ্টের কথা।

এইবার দ্বিতীয় বৈশিষ্টের কথা ধরা যাক। যাহারা মার্কসবাদ লেনিনবাদে বিশ্বাস করেন তাঁহারা লেনিনের—"অসম অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক বিকাশ পুঁজিবাদের বিশেষ নিয়ম। সুতরাং প্রথমে কয়েকটি দেশে কিংবা এমন কি একটী পুঁজিবাদী দেশে সমাজতন্ত্রের জয় সম্ভব" (সিলেক্টেড ওয়ার্কস-৫ম গ্রন্থ পৃষ্ঠা ১৪১) এই কথার সত্যতা স্বীকার করেন এবং একটি দেশে সমাজতন্ত্রের জয় সম্ভব এ কথা তাঁহারা মানেন। কিন্তু ট্রটস্কিবাদীরা তাহা শুধু মানেন না তাহা নয়, ইহাকে অমার্কসবাদী চিন্তা পর্য্যন্ত বলিয়া থাকেন তাঁহারা মার্কসের "...it is our interest and our task to make the revolution permanent, until all more or less possessing classes have been displaced from domination, until the proletariat has conquered state power, and the association of the proletarians, not only in one Country but in all the dominant countries of the world" (মার্কস—সিলেকটেড ওয়ার্কস ২য় গ্রন্থ পৃষ্ঠা ১৬১) কথাগুলির শেষের দিকে অহেতুক জোর দেওয়ায় একদেশে সমাজতন্ত্রের জয়কে অসম্ভব ও অবাস্তব বলেন। মার্কসের উপরোক্ত কথায় বিপ্লবের অবিচ্ছেদ্যতাই বোঝায় অন্যকিছু নয়। বিপ্লবের এই অবিচ্ছেদ্যতার কথা লেনিন ১৯০৫ সালেও বলিয়াছেন

"From the democratic revolution we shall at once, and just in accordance with measure of our strength, the strength of the class conscious and organised poletariat, begin to pass to the socialist revolution. We stand for uninterrupted revolution" (সিলেকটেড ওয়ার্কস ৩য় গ্রন্থ পৃষ্ঠা ১৪৫)। ট্রটস্কির "পার্মানেন্ট বিপ্লবের" গলদ এইখানে নয় তিনি মার্কসের 'পার্মানেন্ট বিপ্লবের অর্থ না বুঝিয়া তাহার সঠিক প্রয়োগে ভুল করিয়া তাহাকে বাস্তব সম্পর্কহীন শুষ্ক পুঁথিগত সূত্রে পরিণত করিয়াছেন।

একদেশে সমাজতন্ত্রের জয়লাভ সম্ভব কি না এ কথা বুঝিতে হইলে জানা দরকার কোন সমাজতান্ত্রিক দেশে দুই ধরণের দ্বন্দ্ব থাকে—একটি তাহার দেশের মধ্যের সর্ব্বহারা শ্রেণী ও কৃষক শ্রেণীর মধ্যে দ্বন্দ্ব অন্যটি—সমাজতান্ত্রিক

SOCIALIST UNITY CENTRE OF INDIA
(West Bengal State Committee)
48, Dharamtola Street, Calcutta-13.

রাষ্ট্রের সহিত পৃথিবীর অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশগুলির দ্বন্দ্ব। প্রথমটিকে বিশেষ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সমাধান করা যাইতে পারে এবং সোভিয়েট রাশিয়ায় তাহা হইয়াছে। ইহাই হইল একটি দেশে সমাজতন্ত্রের জয় কিন্তু যতদিন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বাহিরে পুঁজিবাদী দেশগুলি থাকিবে ততদিন এই জয় লাভ নিশ্চিৎ শেষ জয় লাভ হইতে পারে না যেহেতু পুঁজিবাদী দেশগুলি প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রতিবিপ্লব ঘটাইয়া কিংবা তাহাকে আক্রমন করিয়া পুনরায় পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিবে। প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে এই বিপদ হইতে বাঁচাইতে পারিলে তবেই সমাজতন্ত্রের নিশ্চিৎ জয় হইবে। ইহার জন্য শ্রমিক শ্রেণী কর্ত্তৃক অন্য কয়েকটি দেশের রাষ্ট্রক্ষমতা করায়ত্ত করার দরকার। সুতরাং প্রথমোক্ত জয়ের সহিত দ্বিতীয়োক্ত জয়ের চিন্তাগত গোলমাল করিবার কোনই কারণ নাই। ষ্ট্যালিন একথা জানেন বলিয়াই পরিষ্কার ভাবেই তিনি বলিয়াছেন—"Our country represents two groups of contradictions. One group of contradictions is the internal contradictions that exist between the proletariat and the peasantry (this refers to the building of socialism in one country). The other group of contradictions is the external contradictions that exist between our country as the land of socialism and all the other countries as lands of capitalism (this refers to the final victory of Socialism)." (Leninism পৃষ্ঠা ১৫৮)। প্রথম দ্বন্দ্বটির সমাধান সম্ভব নিজের দেশের চেষ্টায়—"Under the dictatorship of the proletariat we possess ....all that is needed to build a complete socialist society overcoming all internal difficulties, for we can and must overcome them by our own efforts"—কিন্তু দ্বিতীয়টির জন্য—"the victory of workers in at least several countries is..............a necessary condition for the final victory of socialism" (ঐ-পৃষ্ঠা ১৫৯)। সুতরাং ইহা সত্বেও সোভিয়েট রাষ্ট্র "আন্তর্জাতিক সর্ব্বহারা বিপ্লবের পথ ত্যাগ করিয়া প্রতিক্রিয়াশীল ষ্ট্যালিনবাদী জাতীয়তার পথে চলিতেছে" এই অভিযোগ দুরভিসন্ধিমূলক বলিতে হইবে।

১৯২৪ সালে পুনর্মুদ্রিত "১৯১৭ সাল" এই পুস্তকে ট্রটস্কি পরিষ্কারভাবে জানাইয়া দিয়াছেন—"রাশিয়া কিংবা ইংলণ্ডে সফল বিপ্লবের কথাই অচিন্তনীয় যদি না। জার্ম্মানীতে বিপ্লব বটে" এবং সমাজতন্ত্রের বিজয় সম্ভব যদি "ইউরোপের প্রধান প্রধান রাষ্ট্রগুলি ইউরোপের যুক্ত-রাষ্ট্র গঠন করে"। "যদি তাহা সম্ভবপর না হয় তাহাহইলে ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা এবং যুক্তির বিচারে বিপ্লবী রাশিয়া রক্ষণশীল ইউরোপের সম্মুখে নিজেকে রক্ষা করিতে পারিবে একথা চিন্তা করা মারাত্মক ভুল।" ইহার সহিত বিভিন্ন দেশে একসঙ্গে বিপ্লব ঘটাইবার চিন্তার কোন পার্থক্য নাই। অথচ সে চিন্তাকে ট্রটস্কিপন্থীরাও ভুল বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

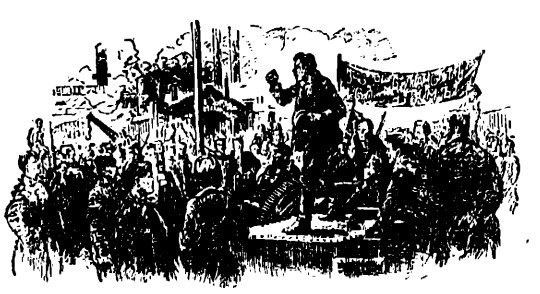

ট্রটস্কির উপরোক্ত কথাগুলি যুক্তিতর্কের খাতিরে স্বীকার করিয়া লইলেও প্রশ্ন থাকিয়া যায় প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র যতদিন আন্তর্জাতিক বিপ্লব না হয় ততদিন বিপ্লবের পর কি করিবে? ইহা কি ধ্বংস হইয়া যাইবে না পুনরায় পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় ফিরিয়া যাইবে? ট্রটস্কি এ বিষয়ে শুধু নীরবই নন তিনি আরও চিন্তা করেন—"ইউরোপের প্রধান প্রধান রাষ্ট্রের সর্বহারা শ্রেণী রাষ্ট্রযন্ত্র দখল করিতে পারিলেই তবে রাশিয়ায় প্রকৃত সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি সম্ভব" (শান্তির কর্ম্মসূচী ১৯২২)। তাহা না হইলে "শ্রমিক

অন্যান্য দেশের শ্রমিক শ্রেণী এতদুর শক্তিশালী হইয়া উঠিতে পারিয়াছে। "ইউরোপের শ্রমিক রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ সাহায্য ব্যতীত রাশিয়ার শ্রমিক শ্রেণী তাহার ক্ষমতা টিকাইয়া রাখিতে পারে না"—এই কথা ট্রটস্কি ৪২ বৎসর আগে বলিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে ইউরোপে অন্য কোন শ্রমিক রাষ্ট্র গড়িয়া উঠে নাই তথাপি রাশিয়ার শ্রমিক শ্রেণী ক্ষমতায় আসীন আজও রহিয়াছে। শুধু ক্ষমতায় আসীন রহিয়াছে তাহা নয়, দিনের পর দিন সারা বিশ্বের শোষিত জনতার তাহার প্রতি সহানুভূতি ও সাহায্য বাড়িয়াই চলিয়াছে, সমগ্র প্রগতিবাদী শক্তির উপর তাহার নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যে বিশ্ব-বিপ্লবের অবাস্তব কল্পনায় ট্রটস্কি মাতিয়া উঠিয়াছিলেন তাহা আজ আর খুব দূরের বিষয় নয়। আগামী তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধেই বিশ্ব পুঁজিবাদী ও বিশ্ব সমাজতন্ত্রী শক্তির মধ্যে শেষ শ্রেণী সংগ্রাম রূপ লইতে যাইতেছে। সোভিয়েট রাষ্ট্রের বাস্তব সঠিক নীতির ফল স্বরূপেই ইহা আসিয়াছে ট্রটস্কির "পার্মানেণ্ট বিপ্লবের" বিশ্লেষণের পথে

বিপ্লবের প্রস্তুতি-গণচেতনার প্রসার

শ্রেণীর রাষ্ট্রের অধঃপতন ঘটিতে বাধ্য।" ইউরোপে শ্রমিক শ্রেণী সম্পূর্ণরূপে প্রধান প্রধান রাষ্ট্রের শাসক আজিও হইতে পারে নাই সুতরাং সোভিয়েট ইউনিয়ন কি পুঁজিবাদী অবস্থায় ফিরিয়া গিয়াছে? ইতিহাস প্রমান দেয় তাহা হয় নাই। লেনিনের "বিজয়ী সর্বহারা শ্রেণী নিজের দেশের বুর্জোয়া শ্রেণীর উৎখাত করিয়া এবং নিজ দেশে সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করিয়া বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলির শোষিত শ্রেণীগুলিকে নিজের নেতৃত্বে টানিয়া আনিয়া পুজিবাদী দুনিয়ার বিরুদ্ধে দাঁড়াইবে" (লেনিন সিলেকটেড ওয়ার্কস—৫ম গ্রন্থ পৃষ্ঠা ১৪১)—এই উপদেশ অনুসারেই চলিয়াছে সোভিয়েট রাষ্ট্র।

সোভিয়েট রাশিয়া বিশ্ব-বিপ্লবের পথ ত্যাগ করিয়াছে বলিয়া ট্রটস্কিপন্থীরা যে অভিযোগ করেন তাহার মধ্যে কণামাত্র সত্যতা নাই। অতি অন্ধ লোকও একথা অস্বীকার করিতে পারে না যে সোভিয়েট রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রের জয়ের জন্যই নয়—এই কথাটি মনে রাখিলেই সোভিয়েটের আন্তর্জাতিক সর্বহারা বিপ্লবে ভূমিকা পরিষ্কার হইয়া যাইবে।

সুতরাং ট্রটস্কির "পার্মানেণ্ট বিপ্লব" শুধু কৃষক শ্রেণীর বিপ্লবে ভূমিকাই অস্বীকার করে নাই, সর্বহারা শ্রেণীর শক্তি, কৃষক শ্রেণীকে তাহার নেতৃত্বে চালিত করিবার যোগ্যতা এবং শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্ব সম্বন্ধেও উপযুক্ত মূল্য দেয় নাই। এইরূপ অবস্থায় ট্রটস্কিপন্থীদের একমাত্র কাজ দাঁড়াইয়াছে বুর্জোয়া শ্রেণীর কণ্ঠে সুর মিলাইয়া সমানে সোভিয়েট রাশিয়াকে জঘন্যভাবে আক্রমন করা। তাহাদের বিশ্ব-বিপ্লবের কথা, বিশ্ব পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সমাজতান্ত্রিক শক্তিগুলির ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট গঠনের কথা মনে আছে কিনা সন্দেহ। দেশে দেশে শ্রমিক শ্রেণীকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের উদ্দেশ্যে সংঘবদ্ধ করিবার প্রচেষ্টা নাই; শুধু আছে রাশিয়াকে হেয় প্রতিপন্ন করিবার উদগ্র বাসনা। ইহাতে শোষিত শ্রেণীর মুক্তির পরিবর্ত্তে বাড়িবে বিভেদ, দেখা দিবে বিভ্রান্তি। ইহার অর্থ দাঁড়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা। তাঁহারা যে ইহা চান না তাহার প্রত্যক্ষ প্রমান দিবার দিন আসিয়াছে কার্য্য ও চিন্তার মধ্য দিয়া।

বর্ত্তমানের কর্ত্তব্য

শ্রেণী সংগ্রামের বর্ত্তমান চুড়ান্ত অবস্থায় আন্তর্জাতিক পুঁজি অধিক দিন বিশ্বসমাজতন্ত্রকে সহ্য করিতে পারে না। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ পরিসমাপ্ত হইবার পর হইতে সমগ্র পৃথিবীতে গণতন্ত্রী সমাজতন্ত্রী শক্তিগুলি যেরূপ দ্রুত প্রসার লাভ করিতেছে তাহাতে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদী দেশগুলি নীরবে ও নিশ্চিন্তে এই অগ্রগতিকে শুধু লক্ষ্য করিয়া যাইবে, তাহাকে ধ্বংস করিবার চেষ্টা করিবেনা এই মত পোষণ করিবার মত কোন বাতুলও আছে কিনা সন্দেহ। সুতরাং বিশ্বপুঁজিবাদের সহিত বিশ্ব সমাজতন্ত্রী শক্তির শ্রেণী সংগ্রাম হইতে বাধ্য এবং সেই শেষ শ্রেণীসংগ্রাম আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের রূপ লইতে যাইতেছে। এই যুদ্ধের ফলাফলের উপর তাই ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের ভাগ্য নির্ভর করিতেছে, যেহেতু এই যুদ্ধে সোভিয়েট পরিচালিত গণতন্ত্রী সমাজতন্ত্রী শিবিরের জয়লাভ হইলে বিশ্বপুঁজিবাদের দিন ফুরাইয়া যাইবে এবং জগতে এক নব যুগ—সর্বহারা গণতন্ত্রের যুগ দেখা দিবে আর পুঁজিবাদী শিবির জয় লাভ করিলে বেশ কিছু সময়ের জন্য সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা পিছাইয়া যাইবে। সুতরাং মার্কসবাদী দল ও সংগঠন হিসাবে প্রত্যেককেই ভবিষ্যত সম্পর্কে উপযুক্ত কর্ম্মপন্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

একথা অবশ্য সত্য যে বিশ্বের অধিকাংশই আবার আর একটি যুদ্ধ চাহে না, প্রত্যেক দেশের প্রকৃত গণতন্ত্রী সমাজতন্ত্রী শক্তি গুলি শান্তিকামী; কিন্তু তাহারা না চাহিলেই যে যুদ্ধ আসবে না এমন নয়। কারণ জগতের প্রধান প্রধান রাষ্ট্র যন্ত্র আজও পুঁজিবাদীদের আয়ত্তে। নিজেদের বাঁচাইবার জন্যই তাহারা যুদ্ধকে জনতার অপত্তি সত্বেও তাহাদের উপর চাপাইয়া দিবে। ইহাকে রোধ করিতে হইলে চাই বুর্জোয়া শ্রেণীকে রাষ্ট্র ক্ষমতা হইতে উচ্ছেদ অর্থাৎ পুঁজিবাদী দেশগুলির সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সাফল্যমণ্ডিত করিতে হইবে। নিছক সংস্কার পন্থী আন্দোলনের দ্বারা যুদ্ধকে ঠেকাইবার কোন উপায়ই না। অথচ বর্ত্তমান জগতের শ্রেণীবিন্যাসের গঠন পরীক্ষা করিলে বুঝা যাইবে

(১৪শ পৃষ্ঠায় দেখুন)

নভেম্বর বিপ্লবের তাৎপর্য

(১৪শ পৃষ্ঠার পর)

সমগ্র যুদ্ধকে ঠেকাইবার পরিবর্ত্তে তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করিবে। এবং এই 'বারংবার' আমেরিকার নেতৃত্বে মিলিত বিশ্ব পুঁজিবাদ যত শীঘ্র যুদ্ধ বাধাইয়া দেওয়া যায় তাহারই চেষ্টা করিতেছে। উপরন্ত কোন শক্তিই কেবলমাত্র অন্তর্নিহিত বিরুদ্ধ শক্তির জন্য আপনা আপনি ভাঙ্গিয়া পড়ে না; পুঁজিবাদও পড়িবে না। পুঁজিবাদকে চিরতরে ধ্বংস করিবার জন্য শেষ আঘাতের প্রয়োজন আছে—সে আঘাত শেষ শ্রেণী সংগ্রামের ভিতর দিয়াই কার্য্যকরীভাবে হানা সম্ভব।

এইভাবে চিন্তা না করিলে যে মারাত্মক বিচ্যুতির সম্ভাবনা আছে তাহা এখন হইতে প্রমান হইতে আরম্ভ হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে শান্তি ফ্রন্ট গঠন করিতে হইলে জনসাধারণকে এমনভাবে শিক্ষিত করিতে হইবে যাহাতে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সময়ে নিশ্চিত ভাবে সে যুদ্ধ চালাইয়া যাহাতে না পারে, কার্য্যকরীভাবে যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে যাহাতে ব্যাহত করা যায়। শুধু চাপ দিয়া সাম্রাজ্যবাদীকে নিবৃত্ত করা যাইবে না ইহা নিশ্চিৎ; অথচ Peace front এর অপব্যাখ্যা করিয়া গ্রেটবৃটেনের কম্যুনিষ্ট দল এখনও বিশ্বাস করে পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থা বাঁচাইয়া রাখিয়া দক্ষিণ-পন্থী সোস্যাল ডিমোক্র্যাটদিগকে বাদ দিয়া বামপন্থী সরকার গঠন করিলেই যুদ্ধকে চিরতরে বন্ধ করা যাইবে। পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদকে জিয়াইয়া রাখিয়া যুদ্ধ রোধ করিবার এই ধরণের উপায় নূতন করিয়া পুঁজিবাদী চক্রের নিকট আত্মসমর্পন করিতে বাধ্য করিবে। অন্য একদল মনে করেন ইতিমধ্যে দেশে দেশে বিপ্লব আরম্ভ করিয়া দিলে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি আর যুদ্ধের জন্য তৈয়ারী হইতে পারিবে না বলিয়া যুদ্ধ বন্ধ হইয়া যাইবে। বন্ধ করিবার পরিবর্ত্তে ইহাতে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যে শক্তিকে চূড়ান্ত ভাবে কার্য্যকরী করা যাইত তাহাকেই প্রস্তুতির অভাবে অসময়ে সংগ্রামে নামাইয়া ধ্বংস করিবার ব্যবস্থা করা হইবে। বিপ্লবের জন্য চাই দেশে দেশে প্রস্তুতি। সে সাংগঠনিক প্রস্তুতির বদলে আজ কোথাও কোথাও বিপ্লব আরম্ভ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে পুঁজিবাদের নাভিশ্বাসের সময়ে তাহাকে শেষ আঘাত হানিবার জন্য এখন সংগঠন করিবার দরকার। অথচ বহু দেশেই বিপ্লব উপযুক্ত সময়ের পূর্ব্বেই আরম্ভ করা হইয়াছে। এই কথা দ্বারা অবশ্য ইহা বুঝায় না যে প্রত্যেক দেশেই যুদ্ধের সময় এক-কালীন বিপ্লব আরম্ভ করিতে হইবে। ক্ষেত্রগত ও চিন্তাগত নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইলে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগেই কোন দেশে বিপ্লব আরম্ভ করিয়া দিতে হইবে সন্দেহ নাই, তবে সঙ্গে সঙ্গে এই কথাটিও স্মরণ রাখা উচিত যে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তির রূপের উপরই এই সব বিপ্লবের সফলতা বিফলতা মূলতঃ নির্ভর করিতেছে। জনসাধারণের সংগ্রামী মনোভাব ও ত্যাগের প্রতি কনা মাত্র অশ্রদ্ধা প্রকাশ না করিয়াও আত্মসমালোচকের দৃষ্টিতে একথা বলা যায় যে দক্ষিণ পূর্ব্ব এশিয়ার গণ অভ্যুত্থানগুলির অবস্থা বিচার করিলে মনে হয় এই সব দেশ বিপ্লবের উপযুক্ত সময়ের পূর্ব্বেই ঠিকভাবে প্রস্তুত না হইয়াই চূড়ান্ত সংগ্রামে অবতীর্ন হইয়াছে। ইহাতে মারাত্মক ক্ষতি হইবারই সম্ভাবনা। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আশানুরূপ প্রতিরোধ ও গণমুক্তি সংগ্রামের পথে এই ক্ষতি অন্তরায় ঘটাইতে পারে।

ভারতীয় শোষিত শ্রেণী উপশ্রেণী গুলিকে এই বাস্তব অবস্থা হইতে শিক্ষালাভ করিতে হইবে। এ. আই. টি. ইউ. সির মধ্য দিয়া শ্রমিক শ্রেণীকে সংগঠিত করিতে হইবে, কৃষক সংঘের মধ্য দিয়া নিম্ন ও মধ্য কৃষককে বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণীর বন্ধুর ভূমিকা পালন করিবার জন্য সংঘবদ্ধ করিতে হইবে, ভূমিহীন গ্রাম্য সর্ব্বহারা শ্রেণীর নিজস্ব পৃথক জঙ্গী প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে হইবে, বুদ্ধিজীবী অংশকে শ্রমিক, কৃষকের পাশে টানিয়া নামাইতে হইবে। এই সব গণতন্ত্রী সমাজতন্ত্রী শক্তিগুলিকে লইয়া শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে সংগ্রামী পুঁজিবাদ বিরোধী সর্বহারার ঐক্যফ্রন্টকে বাস্তবে রূপায়িত করিতে হইবে। অর্থাৎ উপযুক্ত সময়ে সফল বিপ্লবের জন্য সাংগঠনিক প্রস্তুতি ও শ্রমিক নেতৃত্ব সারা দেশে কায়েম করাই বর্ত্তমানে ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক কাজ। ইহাই ভারতের ভবিষ্যত শ্রমিক বিপ্লবের পথকে প্রস্তুত করিবে। নভেম্বর বিপ্লবের ইহাই শিক্ষা।

বাস্তুহারা

(১৫শ পৃষ্ঠার পর)

সমস্যার সমাধানের কথা উঠিলেই জবাব আসে Bad in Law। পশ্চিম বাংলার অনেক মন্ত্রীরই নিজস্ব বড় বড় বাড়ী আছে তাহা সত্বেও সরকারী বাড়ী ভোগ তাঁহারা করিতেছেন কেন? বাস্তুহারারা তাহাতে বসবাস করিলে তাহার আভিজাত্য কি কমিয়া যাইবে! পুনর্বসতির ব্যবস্থা যাহারা করিতে পারে নাই তাঁহারা সংস্থানের ব্যবস্থার কি করিবেন? পশ্চিম বাংলার বহু অনাবাদী খাস জমি পড়িয়া আছে, পূর্ব্ববঙ্গ হইতে অসংখ্য কৃষক পরিবার আসিয়াছে। তাহাদিগের মধ্যে জমিগুলি বিলি করিলে কি হয়? আর চাকুরীর বিষয়ে ইতিমধ্যেই যাহাতে বাস্তুহারাদের প্রতি পশ্চিমবাংলার অধিবাসীদের বিদ্বেষ জাগিয়া উঠে তাহার জন্য "ঘটি বাঙ্গাল" ঝগড়া বাধাইবার চেষ্টা চলিতেছে। অথচ ব্যাপারটি পূর্ব্ববঙ্গ পশ্চিমবঙ্গের সমস্যা নয়। বাস্তুহারাদের সাহায্য করার নামে লক্ষ লক্ষ টাকা নেতাদের আত্মীয়-স্বজনদের পকেটে নির্বিবাদে যাইতেছে নেতাদেরই সহযোগিতায়।

শুধু যে রায় মন্ত্রিমণ্ডলীর এই ব্যবহার তাহা নয়। বোম্বাই সরকারও বাস্তুহারাদিগকে মানুষের মধ্যেই গন্য করে নাই। তাহাদের মতে বাস্তুহারারা "বিপজ্জনক"। সেই জন্য বাস্তুহারার প্রত্যেককে সরকারের কাছে নাম ঠিকানা রেজেষ্ট্রী করাইতে হইবে, ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিলে তৎক্ষনাত সরকারকে জানাইতে হইবে এবং সরকার ইচ্ছা করিলে তাহাদিগকে একস্থান হইতে অন্যস্থানে চালান দিতে ও সেই স্থানে বসবাস করাইতে বাধ্য করিতে পারিবেন। ইহাতে কেহ বাধা প্রদান করিলে বা সরকারের আদেশ অমান্য করিলে পুলিশের যে কোন লোক এমন কি সাধারণ কনষ্টেবল পর্য্যন্ত তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে পারিবে। চমৎকার অবস্থা! দাস প্রথার সহিত ইহার প্রভেদ কোথায়? হিটলারের জার্মানিতে ইহুদিদের যেমন একটি করিয়া ছাপ দেওয়া হইয়াছিল যাহাতে নাৎসীসমর্থকদের তাহাদিগকে লাঞ্ছনা দিবার জন্য খুঁজিয়া বাহির করিতে অসুবিধা না হয় বোম্বাই সরকার সেইরূপ কিছু ছাপের ব্যবস্থা করাইলেই ফ্যাসিবাদের ষোল কলা পূর্ণ হয়—গুরু প্যাটেলের উপযুক্ত শিষ্য হওয়ার সম্মানও জোটে খের সাহেবের।

পূর্ব্ব পাঞ্জাবেও এই এক দশা। পশ্চিম পাঞ্জাব হইতে আশ্রয়প্রার্থী হিসাবে যে ৪০ লক্ষ লোক পূর্ব্ব পাঞ্জাবে চলিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছেন তাঁহাদিগের মধ্যে অনায়াসে ৪৫লক্ষ একরের মত যে জমি পূর্ব্ব পাঞ্জাবের মুসলমানরা পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন তাহা বিলি করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহা না করিয়া জমিদার শ্রেণীর মধ্যে এই জমি বিলি করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ফলে সমস্ত দরিদ্র বাস্তুহারাকে কৃষি মজুরে পরিনত হইতে বাধ্য করা হইতেছে। শুধু তাহাই নহে ভারতবর্ষে যেখানে কোটি কোটি মন খাদ্য দ্রব্যের অভাব তাহা সত্বেও বহু জমি পতিত অবস্থায় ফেলিয়া রাখা হইয়াছে তথাপি দরিদ্র কৃষক পরিবারের মধ্যে চাষের জন্য বিলি করা হয় নাই। কংগ্রেসী সরকারের যে ধনিক তোষণ নীতি সর্বত্রই দেখা যায় তাহার ব্যতিক্রম এইস্থলেও নাই। আর দরিদ্র বাস্তুহারা মেয়েদের অনেককেই দেহ বিক্রয় করিয়া জীবিকা অর্জন করিতে হইতেছে ধর্মভীরু, নীতিবাগিশ কংগ্রেসী নেতাদের ইহাকে দূর করিবার কোন চেষ্টাই নাই।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সমাধান নাই —আছে সংগ্রামের পথে—

যে পুজিবাদী ব্যবস্থার ফল বাস্তুহারা সমস্যা তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিয়া এই সমস্যার সমাধান হইতে পারে না। পাকিস্তান হইতে হিন্দু এবং ভারতীয় ইউনিয়ন হইতে মুসলমান জনসাধারণ সম্পূর্ণরূপে চলিয়া গেলে এ সমস্যার সমাধান হইবে না। তাহাতে দরিদ্র জনসাধারণের দুঃখ দৈন্য অসুবিধা বাড়িয়াই যাইবে। পাকিস্তানের দরিদ্র হিন্দুর স্বার্থ দরিদ্র মুসলমানের স্বার্থ হইতে ভিন্ন নয়, ভারতীয় ডোমিনিয়নের মেহনৎকারী মুসলমানের স্বার্থ শ্রমজীবি হিন্দুর স্বার্থের সহিত অভিন্ন—প্রত্যেক রাষ্ট্রের উভয় সম্প্রদায়ের জনতার সাধারণ শত্রু সামন্ততান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদী শোষণ। এই শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামই এই শোষণকে ধ্বংস করিতে পারে এবং তাহার ভিত্তিতে সাধারণ হিন্দু মুসলমানকে প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে উভয় রাষ্ট্র একত্রিত করা যাইতে পারে। সেই একত্রিত করা এবং একত্রিত গণশক্তির জোরে প্রতিক্রিয়ার ধ্বংস বর্ত্তমানের কাজ। যেইদিন তাহা সফল হইবে সেইদিন বাস্তুহারা সমস্যাও সমাধান হইবে, তাহার আগে নয়।

বেছে নিন

কলিকাতা সহরে অথবা সহরতলীতে আপনার অবস্থা ও আবশ্যক অনুযায়ী মনোরম বসবাসের জমি ও বাড়ী বন্দোবস্ত করে রেখেছেন—

ক্যালকাটা এণ্ড সুবার্ব্বন এষ্টেট লিঃ

৬১, ক্রশ ষ্ট্রীট
কলিকাতা।

নভেম্বর দিবসের ফতোয়া

(২য় পৃষ্ঠার পর)

গড়ে তোলার ভিত্তিতে জনসাধারণের মিলিত সংগ্রামী গণফ্রন্টকে শক্তিশালী করে গড়ে তোলার বদলে বিশ্ববিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিত উন্মুক্ত হবার আগেই বিপ্লব সফল করার স্বপ্ন দেখলে গণসংহতিকে উপযুক্ত সময়ের পূর্বেই ফ্যাসীবাদী দমন-নীতির সামনে অসহায়ভাবে ছেড়ে দেওয়া হবে। বিপ্লবের দায়িত্ব পালনের পরিবর্ত্তে ইহা বিশ্বাসঘাতকতারই নামান্তর হবে। বিশেষ করে আমাদের দেশে নয়াগণতন্ত্রের ধুয়া তুলে কম্যুনিষ্ট দল মার্কসবাদের যে অপপ্রচার আরম্ভ করেছে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক কাঠামোকে যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করে জনসাধারণের সম্মুখে তাদের অসারতা তুলে ধরতে হবে। "সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরেও গণতান্ত্রিক বিপ্লব করা চলে" এই অদ্ভুত মতবাদ জনতাকে বোঝাতে গিয়ে লেনিনের শিক্ষাকে এরা যেরূপ জঘন্যভাবে ব্যবহার করেছে তা অভিনব। নয়া গণতন্ত্রকে বিশেষ আন্তর্জাতীক ও রাজনৈতিক পরিবেশে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পূর্ণ করার বিশেষ কর্মকৌশল হিসেবে না দেখে ধনতন্ত্র হতে সমাজতন্ত্রে পরিবর্ত্তনের অবশ্যম্ভাবী স্তর বলে প্রমাণ করতে গিয়ে রাশিয়ার ফেব্রুয়ারী বিপ্লব হতে নভেম্বর বিপ্লব পর্য্যন্ত বলশেভিক পার্টির বিপ্লবী নীতি যেভাবে বিকৃত ব্যাখ্যা করা হয়েছে তাতে যে কোন মার্কসবাদীর পক্ষে তাদের সুবিধাবাদী নীতিকে বুঝে নিতে বিশেষ কষ্ট হবে না।

সুতরাং প্রত্যেকটি সামবাদী চিন্তায় বিশ্বাসী লোককে বুঝতে হবে যে ভারতের সাম্যবাদী আন্দোলন আর ভারতের কম্যুনিষ্ট দল এক নয়। ভারতের ভবিষ্যত বিপ্লবের জন্যই শোষিত জনসাধারণকে তাই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করে দলগত মোহ কাটিয়ে উঠতে হবে। সর্বশেষে কমরেডদের মনে রাখতে হবে যে ধনিক সরকারের অত্যাচার ও ফ্যাসিষ্ট নীতি এবং ক্ষয়িষ্ণু ধনতান্ত্রিক সমাজের অন্তর্নিহিত গলদই সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে সর্ব্বহারা শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবী ভূমিকার প্রতি আকৃষ্ট করে তুলেছে। নভেম্বর বিপ্লব অন্ধ সংস্কারাচ্ছন্ন ভীত সন্ত্রস্ত জনতার চোখ খুলে দিয়েছে। নভেম্বর বিপ্লব প্রমাণ করেছে—ধনতন্ত্র ও প্রচলিত পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রই সভ্যতার শেষ কথা নয়, এই বিপ্লব দেখিয়েছে আপাতদৃষ্টিতে এই বিরাট ধনতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদী সমাজব্যবস্থা শাশ্বত ও শক্তিশালী মনে হলেও আসলে ইহা জরাগ্রস্থ ও পঙ্গু। নভেম্বর বিপ্লব প্রমান করেছে শ্রমিক শ্রেণী ক্ষমতা পেলে শোষিত জনসাধারণকে নিয়ে মানব প্রগতির স্বার্থে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনে সে সক্ষম।

For

Your Transport Difficulties

PLEASE CONSULT

SUBIMAL GHOSH

&

BROS.

(Sole prop : Subimal Ghosh)

127A, RASH BEHARI AVENUE

PHONE : B. B. 4865

সেনগস্ এণ্ড কোং

জেনারেল হার্ডওয়ার মার্চ্চেণ্ট

চা-বাক্সের সরঞ্জাম, প্লাইউড্ বাক্স, প্রুনিং নাইভস্ প্রভৃতির প্রস্তুতকারক। ফাইলস্, বেল্টিং (হেয়ার এবং রবার), গান-মেটাল ফিটিংস্, পিট-স, হ্যাণ্ড-স্, ইলেকট্রিক্ মোটর, হাউস্‌হোল্ড মিটারস্ প্রভৃতির আমদানীকারক এবং মজুতকারী।

সেনগস্ এণ্ড কোং

১২, নেতাজী সুভাষ রোড

(পুরাতন মার্টিন বিল্ডিং)

কলিকাতা—১

KIRON

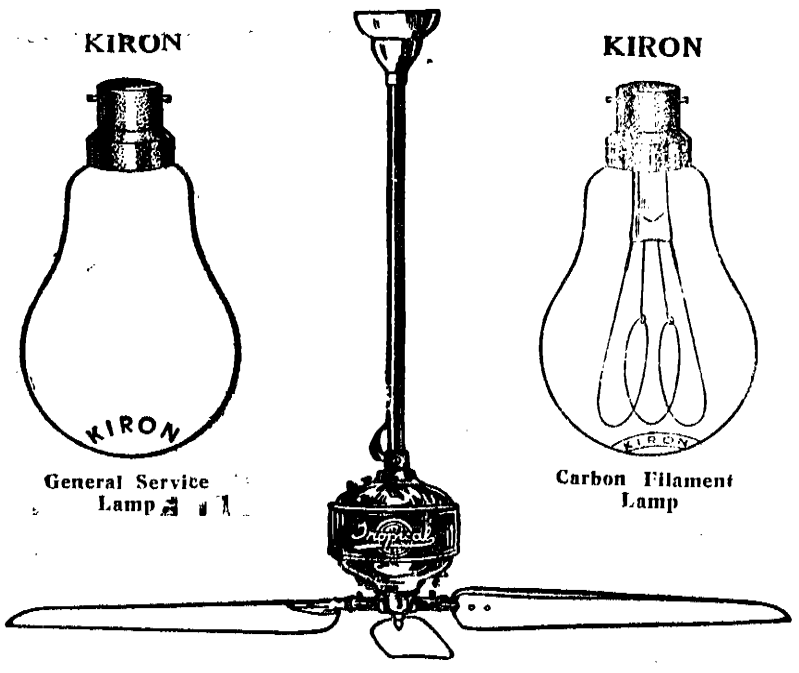

General Service Lamp

Carbon Filament Lamp

"TROPICAL" FANS, A. C. & D. C.

56" Sweep D. C. on rate contract with the Govt. of India.

SIGN OF QUALITY

Agents:

ORIENTAL MERCANTILE CO. LTD.

Head office: 36-A & B · PRATAPADITYA ROAD · CALCUTTA

OMC/3

Gram : 'SELLERS'. Phone : South 864

সঙ্গীত সম্পর্কীয়—

রেডিও ও রেডিওগ্রাম, এমপ্লিফায়ার, ভারতীয় ও ইউরোপীয় রেকর্ড, পিয়ানো, অর্গান, হারমোনিয়াম, বেহালা ও যাবতীয় বাদ্যযন্ত্রের

বিশিষ্ট পরিবেশক—

টি, ই, বেভান এণ্ড কোং

গ্রসভেনর হাউস

শাখা—গলষ্টন ম্যান্‌সনস্ কলিকাতা।

বিগত মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় লিখিত এক অপূর্ব্ব কাহিনী। আই, সি, এস পরীক্ষার্থী স্বাজিত যোগ দিল যুদ্ধে। কাপুরুষ বাঙালীর কলঙ্ক মোচনে গিয়ে বিমান যুদ্ধে সে প্রাণ হারালো—

সিনে প্রোডিউসার্সের সামাজিক চিত্র

মায়ের ডাক

কাহিনী : চাঁদ মোহন চক্রবর্ত্তী

কাহিনী অবলম্বনে : মনিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

সংলাপ : বিজয় গুপ্ত

সুরশিল্পি : সত্যদেব চৌধুরী

পরিচালনা : সুকুমার মুখোপাধ্যায়

ভূমিকায় : অভি ভট্টাচার্য্য, মনোরঞ্জন, মঙ্গল, ফণীরায়, কানু বন্দ্যো, ডাঃ হরেন, অনুভা গুপ্তা, উমা প্রভৃতি—

শুক্রবার ১২ই নভেম্বর হইতে
একযোগে প্রদর্শিত হইতেছে

রূপবাণী • ইন্দিরা

২-৩০, ৫-৩০ ও ৮-৩০টা :: ৩, ৬ ও ৯টা

অগ্রিম আসন বিক্রয় হইতেছে

শ্রীমতী কানন দেবীর নিজস্ব প্রতিষ্ঠান
শ্রীমতী পিকচার্সের
প্রথম নিবেদন

অনন্যা

শ্রেষ্ঠাংশে : কানন দেবী, অনুভা, রেবা, রণু, বিজলী, পুর্ণেন্দু, কমল মিত্র, বিপিন গুপ্ত,
পরিচালনা : সব্যসাচী :: সুর : উমাপতি শীল

মুক্তি পথে

★

শৈলজানন্দ রচিত ও পরিচালিত

রংবেরং

শ্রীপঞ্চমীপার

ভূমিকায় : মলিনা, সিপ্রা, রেণুকা, পাহাড়ী, নীতিশ, ফণীরায় ও নবদ্বীপ

শুক্রবার ১২ই হইতে **বাণীরূপায়** চলিতেছে

(গৌরীবাড়ী)

★

এস, বি, প্রোডাকসন্সের
দ্বিতীয় নিবেদন
সুনন্দা দেবী
অভিনীত ও প্রযোজিত

সিংহদ্বার

কাহিনী : নৃপেন্দ্র কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
পরিচালনা : নীরেন লাহিড়ী
সুরশিল্পী : রবীন চট্টোপাধ্যায়
অন্যান্য চরিত্রে : ছবি, জহর, রবীন, অসিমকুমার, অলকা প্রভৃতি—

প্রস্তুতির পথে

★

একমাত্র পরিবেশক

প্রাইমা ফিল্মস ১৯৩৮ লিঃ

গ্রাম : রূপবাণী :: ফোন : বি, বি, ১১৩
৭৬।৩ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মোগল সম্রাট্ শাজাহানের অকৃপন ঐশ্বর্য্য তাজমহলের শুভ্রতার প্রচ্ছদপট। আর এর মধ্যেই শাজাহান মমতাজের অনবদ্য প্রেম "কালের কপোল তলে শুভ্রসমুজ্জ্বল" হয়ে আছে। কত হৃদয়ের প্রেম পারেনি তাজমহলের মতন এই রকম শুভ্র স্বপ্নে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে, নিঃশব্দ প্রদীপ শিখার মত হয়ত হঠাৎই হারিয়ে গেছে, আকাশের ঝরে যাওয়া তারার মত গেছে মুছে অথবা সুরময় জোয়ারের মত মরুভূমির রুক্ষতার ঠিকানায় পৌছে আর পথরেখা খুঁজে পায়নি।

একপ্রান্তে **মূক "সীতা"** আর এক প্রান্তে **মুখর "জয়তী"**, এরই মাঝে যে সংঘাতের ঝড় উঠল, **শক্তিপদর** প্রকাশ তার মধ্যেই। আর এই ঝড়েই দুর্জ্জয় নেপোলিয়নের মত ভেঙ্গে গেল **সান্যালের** ব্যক্তিত্ব, জয়তীর মুখরতা এইখানে এসেই হঠাৎ মূক হয়ে গেল সান্যালের কাছে তার আত্মসমর্পণের মধ্যে, আর সীতার মূক প্রেম মুখর হয়ে উঠল বন্যবহ্নির চক্রব্যূহের মধ্যে অপূর্ব আত্মসমর্পনে। শক্তিপদ সীতাকে ফিরিয়ে দেয়নি শেষ পর্য্যন্তও আর ফিরেও যায়নি ঐ ওদেরই সমাজে যার হাতে ছিলনা অভিনন্দনের ফুলের মালা অথবা অভিবাদনের অর্ঘ।

"মূক ও মুখর" এই রকমেই একটি কাহিনী যার মধ্যে নিঃশব্দ প্রেমের পদচারণা উচ্চারিত। চিত্রে এই কাহিনীকে প্রাণবন্ত করবার দায়িত্ব নিয়েছেন **সুবিখ্যাত শিল্প নির্দ্দেশক**

ফিল্ম ক্র্যাফ্ট (ইণ্ডিয়া)
আপনাদের নমস্কার ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছে,
১২৭এ, রাসবিহারী এভিনিউ,
বালিগঞ্জ, কলিকাতা।

ধন্যবাদ জ্ঞাপন :—

১। আমাদের অসংখ্য বন্ধুবান্ধব যাঁরা নাম প্রকাশে অসম্মত, তাঁদের সহযোগিতা ও আন্তরিক সহানুভূতির উদ্দেশ্যে আমাদের অজস্র ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

২। এই অনুষ্ঠানলিপি সম্পাদনে 'প্রকাশিকা-প্রতিষ্ঠানের' সত্বাধিকারী শ্রীযুত নির্ম্মল দত্ত মহাশয়ের অক্লান্ত পরিশ্রম ও অমলিন বন্ধুত্বের জন্যে আমাদের অজস্র ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

৩। কণ্ঠলিপি যন্ত্র দিয়ে যাঁরা সহযোগিতা করেছেন আমরা তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

৪। বালিগঞ্জ স্পোর্টিং ক্লাবের সহযোগিতা এই অনুষ্ঠানের একটি বিশেষ সহায়। ধন্যবাদ, বালিগঞ্জ স্পোর্টিং ক্লাবের সভ্যবৃন্দ।

৫। এই অনুষ্ঠানের আলোক সজ্জা সরবরাহ ক'রে "সার্ভিস সিণ্ডিকেট' যে সহানুভূতি দেখিয়েছেন তার জন্য আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

সম্পাদক—প্রীতিশ চন্দ কর্ত্তৃক আর্ট প্রেস ২০ বৃটাশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।—কার্য্যালয়ঃ ১-এ, একজিবিসন রো, কলিকাতা—১৭